Bangladesh
Journal of
Political
Economy

© 2017 Bangladesh Journal of
Political Economy
Vol. 33, No. 2, December 2017, pp. 001-026
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

অর্থশাস্ত্র ও নৈতিকতা: বাংলাদেশে ভূমি গ্রাসের রাজনৈতিক অর্থনীতি

স্বপন আদনান*

১. ভূমিগ্রাস, ধনার্জন ও নৈতিকতা

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড মূলত বৈষয়িক স্বার্থে পরিচালিত হয়ে। তবে, তার মধ্যেও সুনীতি বা দুর্নীতির প্রশ্ন ওঠে। বিদ্যমান আইন ও ন্যায়নীতির কাঠামোর মধ্যেই উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ এবং বিনিয়োগসহ অর্থব্যবস্থার (economy) যাবতীয় কার্যকলাপ পরিচালিত হওয়ার কথা। কিন্তু, পাঠ্যবইয়ের এই আদর্শ চিত্র এবং বাংলাদেশের বাস্তবতার মধ্যে ব্যবধান অনেক। দুর্নীতি এবং অন্যান্য কার্যকলাপ বিদ্যমান পরিস্থিতিতে অর্থশাস্ত্রের (economics) সাথে সুনীতি (ethics) ও নৈতিকতার (morality) সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

আজকের আলোচনায় আমি বিশেষ করে ভূমিগ্রাসের (land grabs) নানাবিধ প্রক্রিয়া এবং কলাকৌশলের দিকে নজর দেবো। ভূমিগ্রাস বা হস্তান্তরের ফলে সার্বিক ভূমি বণ্টনে (distribution) পরিবর্তন ঘটে। পুনর্বণ্টনমূলক ভূমি সংস্কার (redistributive land reform) যেখানে বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে ভূমিসত্ব এবং ভূমি অধিকারে সমতা আনার চেষ্টা করে, সেখানে ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়ায় তার ফলাফল উল্টো। যেহেতু ভূমিগ্রাস করতে পারে শক্তিশালী সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গ, সেহেতু এই প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণত সমাজের দুর্বল ও দরিদ্র শ্রেণি বা সম্প্রদায়ের মানুষ। ভূমি বেদখল প্রক্রিয়া সাধারণত সম্পদ বণ্টনে (asset distribution) বৈষম্য সৃষ্টি করে, যার ফলে দারিদ্র্যের মাত্রা বাড়তে পারে। এই যুক্তিতে ভূমিগ্রাসকে সাধারণভাবে অনৈতিক (unethical) বিবেচনা করা যায়।

এই সিদ্ধান্তটি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে ভূমিগ্রাসের বিভিন্ন প্রক্রিয়া এবং কলাকৌশল আরও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা দরকার। এ জন্য আলোচনায় ভূমি বেদখল প্রক্রিয়ায় শক্তি ও সহিংসতার ব্যবহার, এবং দুর্নীতি ও জালিয়াতির প্রভাব, বিশ্লেষণ করবো। এর ফলে এসব কলাকৌশলের সাথে নৈতিকতার সম্পর্কটি পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে ভূমি সংক্রান্ত আইনকানুন ও ভূমি অধিকার বণ্টন এবং পুনর্বণ্টনের ক্ষমতা রাষ্ট্রযন্ত্রের হাতেই ন্যাস্ত। অন্যদিকে এই রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর নানাধরনের কায়েমী স্বার্থ প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ কোনো শ্রেণি, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর স্বার্থে রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্মকাণ্ড

* প্রাক্তন অধ্যাপক, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুর।

বৈষম্যমূলক এবং অন্যায্যভাবে পরিচালিত হতে পারে। অতএব, ভূমি গ্রাসের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রযন্ত্রের ভূমিকা কতটুকু নৈতিক ও ন্যায্য তা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

রাষ্ট্র ছাড়াও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীও ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়ার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাদের বিরুদ্ধেও শক্তি প্রয়োগ করে সহিংসতা কিংবা জালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে ভূমি দখলের অভিযোগ আছে। অতএব, ভূমি গ্রাসের ক্ষেত্রে নৈতিকতার প্রশ্ন তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

ভূমি দখল করার পেছনে নানা ধরনের স্বার্থ কাজ করতে পারে। সমাজের যাবতীয় শ্রেণি, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর স্বার্থ ও ভূমিকার সাথে বিভিন্ন ধরনের ধনার্জনের (accumulation) প্রক্রিয়া জড়িত থাকে। সমকালীন বাংলাদেশে ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে গেলে রাজনৈতিক অর্থনীতির (political economy) তাত্ত্বিক কাঠামো (theoretical framework) তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে, আদি ধনার্জন (primitive accumulation), পুঁজিবাদী ধনার্জন এবং অন্যান্য ধনার্জন প্রক্রিয়ার (accumulative process) মধ্যে পার্থক্যগুলো স্পষ্টভাবে নিরূপণ করা দরকার। এই পদ্ধতি ব্যবহার করলে বহু বিচিত্র ধরনের ভূমিগ্রাসের ঘটনাকে একটি বিশ্লেষণের ছকে ফেলে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হতে পারে।

এসব প্রাথমিক প্রস্তাবনার ভিত্তিতে আমি সমকালীন বাংলাদেশে ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়ার রাজনৈতিক অর্থনীতির আলোচনা শুরু করছি। এখানে নৈতিকতা ও ধনার্জন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে যে প্রশ্ন ও বিবেচনাগুলো তুলে ধরা হলো, প্রবন্ধের শেষ অংশে সেগুলো নিয়ে আমার বিশ্লেষণের ফলাফল ব্যাখ্যা করবো।

২. ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়ায় সাম্প্রতিক পরিবর্তন

বাংলাদেশে বহুকাল ধরেই ভূমি দখল ও হস্তান্তর প্রক্রিয়া চলে আসছে বিভিন্ন কায়দায়। লাঠিয়াল বাহিনীর জোর খাটিয়ে চর দখল করা এদেশের ভূমি সংঘাতের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিভিন্ন সময়ে দেশের সরকার রাষ্ট্রীয় শক্তি খাটিয়ে ভূমি অধিগ্রহণ করেছে। ঋণ পরিশোধ করতে না পারার দায়ে কৃষকের বন্ধক রাখা জমি মহাজনের হাতে চলে যাওয়ারও দৃষ্টান্ত রয়েছে অনেক।

ভূমিগ্রাসের এসব প্রচলিত পদ্ধতির সাথে আরও নতুন কিছু কলাকৌশল যোগ হয়েছে সাম্প্রতিক কালের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে। বিশেষ করে ১৯৭০-এর দশকে নয়াউদারবাদী বিশ্বায়নের (neoliberal globalization) প্রভাব বাড়তে শুরু করার পর থেকে ভূমির দাম এবং ভূমি ব্যবহারের (land use) ধরনেও বেশ কিছু গুণগত (qualitative) পরিবর্তন ঘটেছে।

১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝি থেকে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার (economy) ওপর কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস (structural adjustment) কর্মসূচির বিভিন্ন শর্ত আরোপ শুরু করে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (International Monetary Fund), বিশ্বব্যাংক, এবং অন্যান্য বিদেশী দাতা সংস্থা (সোবহান ২০০৭: ৩৩২-৩৩৩; আদনান ২০১৩: ১০৫)। এর ফলে যেসব নয়াউদারবাদী নীতির প্রবর্তন হয় তার মধ্যে ছিলো বাণিজ্য উদারীকরণ (liberalization), অর্থব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণের বিধিনিষেধ ক্রমশ শিথিল করা (deregulation) এবং সম্পদ ও উৎপাদনব্যবস্থা ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর করা (privatization)।

অর্থব্যবস্থার পরিচালনায় এসব নীতিগত পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ সরকার এবং আন্তর্জাতিক দাতাসংস্থাগুলো রপ্তানীমুখী (export-oriented) বাণিজ্যিক উৎপাদন বাড়ানোর প্রতি গুরুত্ব দেয়। এই লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় জমি ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর করা এবং জনসাধারণের বসতবাড়ি ও জমিজমা বাণিজ্যিক

খামার এবং শিল্পাঞ্চলে রূপান্তরিত করার জন্যে ব্যাপক সরকারি কর্মসূচি নেয়া হয়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও ভূমি ব্যবহারে এ ধরনের পরিবর্তনের ফলে বিদ্যমান বসতি বা কৃষি জমি ক্রমশ বাণিজ্যিক এলাকায় রূপান্তরিত হতে থাকে। এ কারণে ভূমির বাজার দাম বেড়ে যেতে থাকে এবং জমিজমা একটি মূল্যবান বাজারী পণ্যে রূপান্তরিত হয়। ফলত ভূসম্পত্তি (real estate) কেনাবেচার দালালী (brokering) ও ফটকাবাজী (speculation) বেশ লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয় (ওয়াকার ২০০৮; লেভিয়েন ২০১২; আদনান ও দস্তিদার ২০১১; আদনান ২০১৩)।

এই বিশ্ববাজারমুখী ও নয়াউদারবাদী নীতি পরিবর্তনের ফলে শুধুমাত্র ভূমির ব্যবহার নয়, ভূমি দখলের প্রক্রিয়া ও কলাকৌশলেও কিছু অভিনব পদ্ধতি সংযুক্ত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ভূমিগ্রাসের ক্ষেত্রে তাই নতুন ও পূর্বপ্রচলিত পদ্ধতি উভয়ের সংমিশ্রণ দেখা যায়।

এ বিষয়ে তথ্য উপাত্তের (empirical) ভিত্তিতে আলোচনা করতে গেলেই তাত্ত্বিক কাঠামো (theoretical framework) এবং ধারণা (concept) অপরিহার্য হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক অর্থনীতির (political economy) চিন্তাধারায় ভূমিগ্রাস বা হস্তান্তরকে সাধারণত মার্ক্সের (১৯৭৬: ৮৭৩-৮৯৫) 'আদি ধনার্জন' (primitive accumulation) ধারণার আওতায় বিবেচনা করা হয়। তবে মার্ক্সের উনবিংশ শতাব্দীর অভিজ্ঞতালব্ধ চিন্তাভাবনাকে বর্তমানের নয়া উদারবাদী বিশ্বায়নের যুগের উপযোগী করার লক্ষ্যে হার্ভে (২০০৩: ১৪৪-১৬১) 'বেদখলের মাধ্যমে ধনার্জনের' (accumulation by dispossession বা ABD) ধারণাটি প্রস্তাব করেছেন। এছাড়া, মনে রাখা দরকার যে ভূমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুধুমাত্র আদি ধনার্জন নয়, পুঁজিবাদী ধনার্জনের (capitalist accumulation) বা অন্যান্য প্রক্রিয়ার কারণেও ঘটতে পারে। কাজেই কোনো একটি বিশেষ ভূমি দখলের ঘটনা কি ধরনের ধনার্জন প্রক্রিয়ার (accumulative process) আওতায় পড়বে তা অনুধাবনের জন্য তাত্ত্বিক কাঠামো ও নির্ভুল বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। সেজন্যে ভূমিগ্রাস ও হস্তান্তরের তথ্যাবলীকে প্রথমে যে বিশ্লেষণের ছকে ফেলা হবে তার তাত্ত্বিক তাৎপর্য এই প্রবন্ধের শেষ অংশে আলোচনা করবো।

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্ন উঠে আসে যেগুলো এই প্রবন্ধে আলোচনা করতে চাই:

১. সমকালীন বাংলাদেশে কি কি ভিন্ন ধরনের ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়া দেখা যায়? সেগুলো কি একটা বিশ্লেষণের ছকে সাজানো সম্ভব?
২. ভূমিগ্রাসের জন্য শক্তি প্রয়োগ করা কি অপরিহার্য? নাকি, বলপ্রয়োগ ছাড়াও অন্যান্য পন্থায় এই একই লক্ষ্য অর্জন করা যায়?
৩. সরাসরি ভূমি গ্রাসের লক্ষ্যে পরিচালিত সচেতন প্রচেষ্টা ছাড়াও অন্য ধরনের পরোক্ষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কি জমি হস্তান্তর ঘটতে পারে?
৪. সমকালীন ভূমিগ্রাসের মাধ্যমে কি পুঁজিবাদী ধনার্জন (capitalist accumulation) না আদি ধনার্জন (primitive accumulation) প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়?

এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য বাংলাদেশে ভূমিগ্রাসের বিভিন্ন ঘটনা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত নিচের আলোচনায় দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরা হবে। এভাবে যে প্রাথমিক বিশ্লেষণ দাঁড় করানো হবে তার ভিত্তিতে আরও বিস্তারিত বিবরণমূলক (descriptive) এবং বিশ্লেষণাত্মক (analytical) আলোচনা করা যেতে পারে। অবশ্য, এই প্রবন্ধে ভূমিগ্রাসের সব প্রাসঙ্গিক ও তাত্ত্বিক (theoretical) দিকগুলো বিস্তারিতভাবে

আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে, কয়েকটি বিষয় এখানে উল্লেখ করছি যাতে আলোচনার সামগ্রিক ব্যাপ্তি গোড়াতেই বুঝিয়ে দেয়া যায়।

প্রথমতঃ ভূমি গ্রাসের পেছনে শ্রেণিগত সংঘাত ছাড়াও রাষ্ট্রীয় বৈষম্য ও নীতি, সাম্প্রদায়িক (communal) বিদ্বেষ, এবং অপরাধচক্রের (criminal) তৎপরতাও কাজ করতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, যাদের জমি বেদখল হওয়ার আশংকা থাকে তারা বিভিন্ন ধরনের দরকষাকষি (negotiations) কিংবা প্রতিরোধ (resistance) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভূমিগ্রাস রুখবার চেষ্টা করতে পারে। তার সাথে উভয় পক্ষের বৈধতার (legitimacy) সংগ্রামও চলে। এসব জটিল ও বহুমাত্রিক (multi-dimensional) প্রক্রিয়া জমি দখলের চূড়ান্ত পরিণতি নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নীচের আলোচনায় বিভিন্ন বাস্তব দৃষ্টান্ত দিয়ে ভূমিগ্রাসের এই জটিল মাত্রাগুলো বোঝানোর চেষ্টা করবো।

এই প্রবন্ধের বাকি অংশ কয়েকটা পরিচ্ছেদে (section) ভাগ করা হয়েছে। পরের (৩নং) পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের বাস্তব পরিস্থিতিতে ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করার জন্য যেসব অনুমান ও ধারণার প্রয়োজন হবে সেগুলো সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করেছি। এ জন্য বিভিন্ন ধরনের দখল প্রক্রিয়া ও কলাকৌশলের মধ্যে প্রকারভেদের (typology) একটা ছক উপস্থাপন করা হয়েছে। এর পরের পরিচ্ছেদগুলোতে (৪, ৫, ৬ ও ৭ নং) এই প্রকারভেদ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়ার কলাকৌশল বাস্তব দৃষ্টান্তের তথ্যাদিসহ তুলে ধরা হয়েছে। শেষ (৮নং) পরিচ্ছেদে এই বিশ্লেষণের মূল সিদ্ধান্তগুলোকে একত্র করে উপসংহার টানা হয়েছে। তার সাথে ভূমি গ্রাসের মাধ্যমে সমকালীন বাংলাদেশে কি কি ধরনের ধনার্জন প্রক্রিয়া (accumulative process) পরিচালিত হচ্ছে তার একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছি।

৩. আলোচনার ছক

ভূমি বেদখলের সংজ্ঞা

ভূমিগ্রাস নিয়ে আলোচনার জন্য যে ধারণাগুলো ব্যবহার করা প্রয়োজন সেগুলো গোড়াতেই পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা দরকার।

কোনো এক পক্ষের জমি অন্য পক্ষের কাছে হস্তান্তরিত হবার প্রক্রিয়া প্রচলিত আইন অনুযায়ী ঘটতে পারে অথবা আইনবহির্ভূত বা সহিংস কৌশলেও হতে পারে। যেসব ক্ষেত্রে জমি হস্তান্তর আইনসিদ্ধ প্রক্রিয়ায় ঘটে সেগুলোকে ভূমি 'দখল' বলে আখ্যায়িত করা যায়। এর বিপরীতে, যেসব ক্ষেত্রে জমি জোর করে বা অবৈধভাবে হস্তান্তরিত হয়, সেগুলোকে ভূমি 'বেদখল' হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। জমি দখল এবং বেদখল উভয় প্রক্রিয়াকে একসাথে নির্দেশ করার জন্য 'ভূমিগ্রাস' (land grabs) শব্দবন্ধটি এই প্রবন্ধে ব্যবহার করেছি।

এখানে 'ভূমি' বলতে আবাদী জমি ছাড়াও বনভূমি, চারণভূমি, জনবসতি, জলাভূমি, ভূগর্ভস্থ পানি, খনিজ পদার্থ ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের এসব সম্পদ বেদখল হলে তা ভূমি গ্রাসের (land grab) ধারণার আওতায় আসবে। যেসব বিশেষ ক্ষেত্রে (special case) পরিবেশ রক্ষার যুক্তিতে ভূমিগ্রাস করা হয় সেগুলোকে 'green grabs' বা 'প্রাকৃতিক দখল' বলা হয়ে থাকে (ফেয়ারহেড ও অন্যান্য ২০১২)।

সমকালীন বাংলাদেশে অনেক ক্ষেত্রেই জমিজমার সঠিক দালিলিক প্রমাণাদি থাকে না। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের ভূমি অধিকারের প্রচলনও রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রীয়, এজমালি, প্রথাগত (customary), সম্মিলিত বা সর্বজনের (common) এমন নানা ধরনের জমি মালিকানা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এছাড়া, অনেক জমির রেকর্ড করা মালিকানা এক পক্ষের নামে থাকলেও বাস্তবে অন্য কোনো পক্ষ সে জায়গাটা দখল করে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। যেমন, অনেক সরকারি খাস জমি কার্যত বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা বা ব্যক্তিবর্গের দখলে রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দালিলিক অধিকারের বদলে সামাজিক ও প্রথাগত রীতি অথবা মৌখিক চুক্তি বা বোঝাপড়ার ভিত্তিতে জমির নিয়ন্ত্রণ নির্ধারিত হয়ে থাকে। এসব বিভিন্ন কারণে জমিগ্রাসের সকল ঘটনা শুধুমাত্র মালিকানাসত্ব (*de jure* ownership rights) দিয়ে বিবেচনা করতে গেলে পুরোপুরি বোঝা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে দখলিসত্ত্বের (*de facto* possessory or occupancy rights) ভিত্তিতে ভূমি হস্তান্তর ঘটে। নিচের আলোচনায় জমির মালিকানাসত্ব কিংবা দখলিসত্ত্বের যে কোনো একটার হস্তান্তর ঘটলেই সেটাকে ভূমিগ্রাস হিসেবে গণ্য করা হবে।

বর্তমানে বহু ধরনের দেশিবিদেশি এবং সরকারি ও বেসরকারি শক্তি বাংলাদেশে ভূমিগ্রাসে লিপ্ত। সরকারি দখলদারদের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় বিভাগ ও সংস্থা, নিরাপত্তা বাহিনী, উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান, প্রভৃতি। অন্যদিকে, যেসব বেসরকারি (private বা non-state) শক্তি ভূমি গ্রাসে অংশ নিয়েছে তাদের মধ্যে আছে কিছু দেশি ও বিদেশি কোম্পানি, বেসরকারি সংস্থা, ব্যবসায়িক এনজিও (NGO), তথাকথিত 'উন্নয়ন' প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন শ্রেণির এবং ধর্মীয় ও জাতিগত সম্প্রদায়ের ক্ষমতাবান ব্যক্তিবর্গ, শাসক গোষ্ঠী (elites), ইত্যাদি।

বর্তমানে বাংলাদেশে ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়ার ব্যাপ্তি প্রায় সর্বজনীন। সমাজের সর্বস্তরে বিদ্যমান শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ছাড়াও প্রতিবেশী, পাড়াপড়শী, বা গ্রামবাসীর হাতেও সমাজের দুর্বল শ্রেণির মানুষের এবং জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জায়গাজমি বেদখল হয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের সব সময় চলমান প্রক্রিয়াকে 'প্রাত্যহিক ভূমিগ্রাস' (everyday land grabs) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে (ফেল্ডম্যান ২০১৬, ফেল্ডম্যান ও গাইসলার ২০১২: ৯৭১)।

ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়া ও কলাকৌশলের প্রকারভেদ

ভূমিগ্রাসের বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ পড়লে অনেক রকমের কলাকৌশল বা পদ্ধতি চোখে পড়ে। এসব দৃষ্টান্তকে বিশ্লেষণের ছকে আনতে গেলে ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়ার কয়েকটা মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে সনাক্ত করা দরকার।

প্রথমত: দেখতে হবে যে বল প্রয়োগের মাধ্যমে ভূমিগ্রাস করা হচ্ছে কি না। অনেক ক্ষেত্রে জবরদখল করার জন্য লাঠিয়াল বা মাস্তান বাহিনী ব্যবহার করা হয়। এগুলোকে সহিংস (violent) শক্তিপ্রয়োগ বলা যায়। কিন্তু, খোলাখুলি সহিংসতা ছাড়াও শক্তি প্রয়োগ ঘটে যখন রাষ্ট্রীয় আইন ও সরকারি নিয়মনীতি প্রয়োগ করে 'পরিচ্ছন্ন আইনি কায়দায়' কোনো সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর ভূমি অধিকার হরণ করা হয়। অন্যদিকে, বাংলাদেশের অভিজ্ঞতায় কোনো শক্তি প্রয়োগ ছাড়াই অন্য কৌশল ব্যবহার করে ভূমিগ্রাসের বাস্তব দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয়ত: ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ (direct) অথবা পরোক্ষ (indirect) হতে পারে। যখন এক পক্ষ আরেক পক্ষের জমি *সরাসরি* নিয়ে নেয় সেটাকে *প্রত্যক্ষ* ভূমিগ্রাস বলা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, লাঠিয়াল দিয়ে চর দখল করা। অথবা রাষ্ট্রীয় আইন প্রবর্তন করে কোন বিশেষ জাতিগোষ্ঠী বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভূমি অধিকার বাতিল করে সেগুলো রাষ্ট্রের আওতায় নিয়ে আসা। এর বিপরীতে, এমন কিছু প্রক্রিয়া আছে যেগুলোর মূল উদ্দেশ্য ভূমিগ্রাস নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এগুলোর কার্যকারণে (structure of causation) যে ঘটনাপরম্পরা সৃষ্টি হয় তাতে শেষ পর্যন্ত সেই গোষ্ঠীর ভূমির অধিকার অন্য কারও হাতে চলে যেতে পারে। এ ধরনের কার্যকারণ প্রক্রিয়াকে *পরোক্ষ* ভূমিগ্রাস বলা যায়। বাংলাদেশে এমন পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ উভয় ধরনের ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে ।

এই দুই জোড়া মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে সমন্বিত করলে চার ধরনের ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়া সম্বলিত একটি প্রকারভেদের (typology) ছক দাঁড় করানো যায় (আদনান ২০১৬: ৭):

ওপরের ছকে বল প্রয়োগ করে যেসব কায়দায় ভূমিগ্রাস করা হয়, সেগুলোকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হিসেবে পুনরায় ভাগ করা (sub-divide) হয়েছে। অনুরূপভাবে, বল প্রয়োগ ছাড়া ভূমিগ্রাসের বিশ্লেষণে প্রত্যক্ষ

ভূমি গ্রাসের ধরন	প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়া	পরোক্ষ প্রক্রিয়া
বলপ্রয়োগসহ	১. প্রত্যক্ষ ও বলপ্রয়োগসহ	২. পরোক্ষ ও বলপ্রয়োগসহ
বলপ্রয়োগ ছাড়া	৩. প্রত্যক্ষ ও বলপ্রয়োগ ছাড়া	৪. পরোক্ষ ও বলপ্রয়োগ ছাড়া

ও পরোক্ষ পদ্ধতির ভিন্নতাও ওপরের ছকে স্থান পেয়েছে।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক ভূমিগ্রাসের অভিজ্ঞতায় এই চার ধরনের প্রক্রিয়ার নিদর্শন পাওয়া যায়। নিচের আলোচনায় বাস্তব দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ভূমিগ্রাসের এই ক'টি মৌলিক প্রক্রিয়া এবং সেগুলোতে ব্যবহৃত বিভিন্ন কলাকৌশল ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৪. প্রত্যক্ষ বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ভূমিগ্রাস

প্রত্যক্ষভাবে শক্তি প্রয়োগ করাটাই সমকালীন বাংলাদেশে ভূমিগ্রাসের সবচেয়ে প্রধান ও বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। এই বলপ্রয়োগ কখনও সহিংস রূপ নেয় এবং কখনও হয় প্রশাসনিক ও আইনি পদ্ধতির (administrative and legal procedure) মাধ্যমে। এ রকম বলপ্রয়োগ করে ভূমিগ্রাসের পদ্ধতি সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থা উভয়েই ব্যবহার করে থাকে। এর মধ্যে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ও বিভাগের ভূমিকা প্রথমে আলোচনা করছি। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রযন্ত্র সচরাচর যেসব পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে তার মধ্যে প্রধান দু'টো হচ্ছে: অধিগ্রহণ (acquisition) এবং নিরাপত্তায়ন (securitization)।

রাষ্ট্রীয় ভূমি অধিগ্রহণ

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ঘটে যখন সরকার আইন ব্যবহার করে এবং ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেশের মধ্যে যে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার জমি নিজের এখতিয়ারে নিয়ে আসে। সরকারি কিংবা বেসরকারি সংস্থা উভয়ের জন্যেই রাষ্ট্রের প্রশাসন এভাবে অধিগ্রহণ করে জায়গার ব্যবস্থা করে থাকে।

এই কাজের জন্য বাংলাদেশে বিদ্যমান আইন হচ্ছে ১৯৮২ সালে প্রবর্তিত 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ'। এছাড়া, পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্রোহ-দমন (counter-insurgency) কর্মসূচির

প্রেক্ষাপটে আরও একটা কঠোর আইন ব্যবহার করা হয়: ১৯৫৮ সালের '(ভূমি অধিগ্রহণ) রেগুলেশন' ('Regulation')। এছাড়া ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির (CHT Regulation 1900) বিভিন্ন ধারাও এই অঞ্চলে ভূমি অধিকার হস্তান্তরের প্রচলিত প্রণালী অনুযায়ী প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।[১]

এসব বিভিন্ন অধিগ্রহণ আইনের অন্তর্গত একটি মৌলিক নীতি (principle) হলো ভূমি সম্পদের ওপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বা এখতিয়ার সর্বোচ্চ (eminent domain)। এই ক্ষমতার বলে যে কোনো জমির ওপর বিদ্যমান সব অধিকারকে নাকচ করে দিয়ে রাষ্ট্র 'জনস্বার্থে' (public purpose) সেই এলাকা নিজের এখতিয়ারে নিয়ে আসতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় যাদের জমি নেয়া হয় রাষ্ট্র তাদের প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করতে পারে। ভূমি অধিগ্রহণের পর সেই জায়গা অন্য যে কোনো সরকারি বা বেসরকারি (প্রাইভেট) প্রতিষ্ঠানকে নিয়ম অনুযায়ী বরাদ্দ (allot) করার ক্ষমতাও রাষ্ট্রের রয়েছে।

অবশ্য, এসব আইনে যাদের জমি অধিগ্রহণ করা হয় তাদের জন্য সীমিত ক্ষতিপূরণের (compensation) এবং, ক্ষেত্রবিশেষে, বিকল্প জায়গায় আংশিক পুনর্বাসনের (rehabilitation) ব্যবস্থা থাকতে পারে। তবে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের কথা থাকলেও সেটার বাস্তবায়নে কিছু পদ্ধতিগত সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা দেখা যায়। যাদের মালিকানাসত্ত্বের (ownership rights) দলিল প্রমাণাদি আছে সরকারি আইনে শুধুমাত্র তাদেরকেই ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়। ফলে, যাদের শুধুমাত্র দখলিসত্ত্ব (possessory or occupancy rights) আছে তাদেরকে রাষ্ট্র ক্ষতিপূরণ পাওয়ার যোগ্য বলে স্বীকার করে না। এছাড়া, যাদের মালিকানা বা দখলিসত্ত্ব কোনোটাই নেই, কিন্তু যারা অধিগ্রহণকৃত জমি তাদের জীবিকার জন্য ব্যবহার করে (যেমন, গরু চরানো, মাছধরা বা কাঠখড় কুড়ানো), বিদ্যমান আইন তাদেরও ক্ষতিপূরণ পাবার যোগ্য বলে বিবেচনা করে না। উপরন্তু, মালিকানাসত্ত্বের ভিত্তিতে যাদের ক্ষতিপূরণ পাওয়া স্বীকৃত তাদেরকেও অনেক ক্ষেত্রে নির্ধারিত দামের চেয়ে কম হারে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় কিংবা দুর্নীতির মারপ্যাঁচে ফেলে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ থেকে প্রায় সম্পূর্ণ বঞ্চিত করা হয় (আদনান এবং অন্যান্য ১৯৯২:৪১-৪৫; ১৯৯৪:৩৬-৩৯)।

রাষ্ট্রীয় ভূমি অধিগ্রহণের অভিজ্ঞতা

বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ও প্রয়োজনে রাষ্ট্র ভূমি অধিগ্রহণ করে থাকে। তার মধ্যে একটি হলো সরকারি সংস্থাসমূহের প্রকল্প এবং কার্যক্রমের স্থাপনার জন্যে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সরকারের বন বিভাগ হচ্ছে দেশের অন্যতম বৃহত্তম ভূমি দখলকারী সংস্থা। বিগত দশকগুলো একসাথে ধরলে পার্বত্য চট্টগ্রামেই বন বিভাগ ২ লক্ষ একরের বেশি জমি অধিগ্রহণ করেছে, অনেক ক্ষেত্রেই এলাকার আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে বেআইনীভাবে উৎখাত করে (আদনান ও দস্তিদার ২০১১: ৪৮-৫৬)। আইন ও সালিশ কেন্দ্রসহ কয়েকটি বেসরকারি সংস্থার অনুসন্ধান থেকে জানা যায়, কক্সবাজার, বান্দরবান, পাবনা এবং নোয়াখালী জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর কার্যক্রমের জন্য ব্যাপক ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে (আইন ও সালিশ কেন্দ্র এবং অন্যান্য ২০১৭; সর্বজনকথা ২০১৫: ৭-৮)। এটাও বেশ আশ্চর্য যে, আইনের নির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহ কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ করার এবং ক্ষতিপূরণ দেয়ার নিয়ম থাকলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা সেটা মেনে চলে না (আদনান ও দস্তিদার ২০১১: ৪৫-৬০)। ভূমি অধিগ্রহণের সময় যেসব

১. এসব বিদ্যমান আইনের বদলে ভূমি অধিগ্রণের জন্য একটি নতুন এবং 'আধুনিকায়িত' বিধি প্রণয়নের প্রচেষ্টা চলছে। এর সম্ভাব্য শিরোনাম হবে: 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন ২০১৭'।

সরকারি সংস্থাগুলোর আইন রক্ষা করার কথা তারাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আইন লঙ্ঘন করে রক্ষকের বদলে ভক্ষকের ভূমিকা পালন করে।

বর্তমানে রাষ্ট্রীয় ভূমি অধিগ্রহণের একটি প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের 'বিশেষ' (special) অর্থনৈতিক অঞ্চল বা জোন (Zone) স্থাপনের জন্য নির্ধারিত এলাকা দখল করা বা কিনে ফেলা। এ অঞ্চলগুলো সরকারি অথবা বেসরকারি মালিকানায় ও উদ্যোগে স্থাপিত হতে পারে। সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এ ধরনের এলাকাগুলোর মধ্যে রয়েছে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (Special Economic Zone or SEZ), রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল (Export Processing Zone or EPZ), চিংড়ি মহাল (Shrimp Zone), ইত্যাদি।

মূলত ১৯৮০-র দশক থেকে বাংলাদেশে এ ধরনের বিশেষ অঞ্চলের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ শুরু হয় (গার্ডনার ও গেরহার্জ ২০১৬: ১০)। ইদানিং, দেশে ১০০টা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ) স্থাপনের ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছে সরকারের মুখপাত্রেরা। ২০১৬ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত বেসরকারি (প্রাইভেট) উদ্যোগে গোটা দশেক বিশেষ অঞ্চল গঠনের ঘোষণা পাওয়া গেছে (প্রথম আলো, ২৮ জুলাই, ২০১৬)।

এই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে পুঁজি বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য সরকার দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আয়কর থেকে সাময়িক রেয়াতসহ নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা (concessions) ও প্রণোদনা (incentives) ঘোষণা করেছে (মির্জা ২০১৫: ৫৩)। এ ছাড়া, অঞ্চলগুলোর (জোনের) সীমানার মধ্যে নানাবিধ বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কারখানা স্থাপনের পর যে বাড়তি জায়গাজমি থাকবে সেগুলোতে 'পেজান' কর্তৃপক্ষ ও ডেভেলপাররা (developer) বিত্তশালীদের জীবনযাত্রার (life-style) সাথে মানানসই বিনোদন ও সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারবে। যেমন: অভিজাত আবাসিক এলাকা, শপিং মল বা সুপার মার্কেট, বিলাসবহুল হোটেল, পর্যটন কেন্দ্র, গল্ফ (golf) ও অন্যান্য ক্রীড়ার জন্য নির্ধারিত এলাকা, প্রাইভেট হাসপাতাল এবং স্কুল, কলেজ ইত্যাদি (সংবাদ, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬; প্রথম আলো, ২৮ জুলাই, ২০১৬)।

এ ধরণের ভূমি ব্যবহার (land use) বৃদ্ধি পেলে এই বিশেষ অঞ্চলগুলোর ভেতরে এবং চারপাশে বাণিজ্যিক ভূমি বেচাকেনা এবং ভূসম্পত্তি (real estate) নিয়ে ফটকাবাজী (financial speculation) একই সাথে উৎসাহিত হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ২০০৩ সালে নোয়াখালীতে চিংড়ী মহাল (Shrimp Zone) ঘোষণার পর বেদখলকৃত জমির একাংশ সম্ভাব্য রিয়াল এস্টেট কেনাবেচা এবং ফটকাবাজীর মুনাফার আশায় দখলদার গোষ্ঠীকে ফেলে রাখতে দেখা যায় (আদনান ২০১৩: ১২০-১২২)। ভারতেও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের (Special Economic Zones) জন্য অধিগ্রহণ করা ভূমি এবং তার চারপাশে উচ্চবিত্তের আবাসন নির্মাণ ও লগ্নী পুঁজির ফটকাবাজীর সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় (সাম্পাত ২০০৮; ওয়াকার ২০০৮: ৫৮৮-৫৮৯; লেভিয়েন ২০১২: ৯৩৪; আদনান ২০১৪: ২৯)।

সরকারি সংস্থা ছাড়া প্রাইভেট কোম্পানী ও অন্যান্য বেসরকারি সংস্থার জন্যেও বাংলাদেশের রাষ্ট্রযন্ত্র জমি অধিগ্রহণ করে থাকে। এসব ক্ষেত্রে সরকার প্রথমে তার সর্বোচ্চ এখতিয়ারের (eminent domain) ক্ষমতা ব্যবহার করে এবং জনস্বার্থের (public interest) যুক্তি দেখিয়ে জনসাধারণের জমি অধিগ্রহণ করে। পরবর্তীতে, রাষ্ট্র সেই জমি কোনো বাণিজ্যিক বা প্রাইভেট সংস্থাকে চুক্তির মাধ্যমে প্রদান করে বা ইজারা দেয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, সিলেটের বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজনীয় জমি প্রথমে স্থানীয় সরকারি প্রশাসনের মাধ্যমে অধিগ্রহণ করা হয়। তারপরে সেই জমি বহুজাতিক কর্পোরেশন ইউনোকাল (Unocal)-কে ইজারা (lease) দেয় প্রশাসন। পরবর্তীতে, ইউনোকালের কাছ থেকে গ্যাসক্ষেত্রের এলাকাটি শেভ্রন (Chevron) নামের আরেকটি বহুজাতিক কর্পোরেশনের হাতে চলে যায় (গার্ডনার ২০১২: ৮৭; গার্ডনার ও অন্যান্য ২০১৪; আহাসান ও গার্ডনার ২০১৬)।

ভূমি অধিগ্রহণের আইন প্রয়োগ ছাড়াও এই বহুজাতিক গ্যাস কোম্পানীকে নির্বিবাদে জমি ছেড়ে দেয়ার জন্য রাষ্ট্রীয় প্রশাসন এবং নিরাপত্তা বাহিনী স্থানীয় মানুষের ওপর নানা ধরনের চাপ সৃষ্টি করে। ভূমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে এলাকাবাসীর প্রতিবাদ মিছিল (protest demonstrations) এবং রাস্তা বন্ধ (road blockade) কর্মসূচিকে রাষ্ট্রীয় শক্তি দিয়ে কঠোরভাবে দমন করা হয় (গার্ডনার ও অন্যান্য ২০১৪: ৩; আহাসান ও গার্ডনার ২০১৬: ৫)। সে সময়কার ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক পার্টির নেতাকর্মীবৃন্দ এবং সিলেটের জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা এলাকার অধিবাসীদের ওপর একযোগে চাপ দেয় যাতে গ্যাসক্ষেত্রের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া তাদের প্রতিরোধের (resistance) কারণে আটকে না যায়।

অনুরূপ ভূমিগ্রাসের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় দিনাজপুরের ফুলবাড়িতে, যেখানে একটি উন্মুক্ত কয়লাখনির জন্য রাষ্ট্র জমি অধিগ্রহণ করে এবং তা এশিয়া এনার্জী নামের একটি ভুঁইফোড় বিদেশি কোম্পানীর কাছে হস্তান্তর করে (মুহাম্মদ ২০১৬: ৩২-৩৩; নূরে মওলা ২০১৬: ২-৩)। এই উন্মুক্ত কয়লাখনির জন্য যে এলাকা বেদখল করা হয় তা ছিলো তিনফসলা আবাদী জমি। উপরন্তু, এই খনির জন্য যে পরিমাণ জমি প্রয়োজন ছিলো তার চেয়ে অনেক বেশি জায়গা অধিগ্রহণ করা হয়। এসব কারণে ফুলবাড়িতে কয়লাখনি স্থাপন এবং জমি দখলের বিরুদ্ধে এলাকাবাসীর জোরালো প্রতিবাদ গড়ে ওঠে। এই প্রতিরোধ দমন করার জন্য সরকার ও প্রশাসন সহিংস পুলিশী নির্যাতন চালায়, যার ফলে প্রতিবাদী মানুষের মধ্যে ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটে (মুহাম্মদ ২০১৬, গার্ডনার ও গেরহার্জ ২০১৬: ১১)।

এসবক্ষেত্রে, নয়াউদারবাদী রাষ্ট্রই প্রাইভেট কোম্পানির জন্য জমির দালালের (broker) ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে (ভাদুড়ী ২০০৮; ওয়াকার ২০০৮: ৫৮০; লেভিয়েন ২০১২: ৯৪১-৯৪৫; আদনান ২০১৩: ১১৭; ২০১৪: ২৯)। বস্তুত 'জনস্বার্থের' নামে এলাকাবাসী মানুষের জমি অধিগ্রহণ করা হলেও সেই জায়গাগুলো পরবর্তীতে মুনাফাকামী প্রাইভেট কোম্পানির স্বার্থের জন্য তুলে দেয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে রাষ্ট্রের ভূমিকা নিঃসন্দেহে অন্যায্য (unjust) এবং জনস্বার্থের পরিপন্থী বলেই প্রতীয়মান হয়েছে (মির্জা ২০১৫:৫৩)। এ কারণে রাষ্ট্রের ভূমি অধিগ্রহণের বৈধতাও (legitimacy) প্রশ্নবিদ্ধ ও ক্ষুণ্ন হয়েছে। রাষ্ট্রের এই ভূমিগ্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ জন্মেছে তার ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীতে ক্ষতিগ্রস্ত জনমানুষের প্রতিরোধ (people’s resistance) আন্দোলন গড়ে উঠতে পেরেছে (আদনান ২০০৪; ২০১৩; ২০১৪)। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সম্ভাব্য বিমানবন্দরের জন্য আরিয়াল বিলে ভূমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে এলাকাবাসীর প্রবল বিক্ষোভের কারণে শেষ পর্যন্ত প্রকল্পটি বন্ধ করে দেয়া হয়।

নিরাপত্তায়নের নামে ভূমিগ্রাস

অধিগ্রহণ ছাড়াও যে পদ্ধতির মাধ্যমে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যাপকভাবে ভূমিগ্রাস করেছে তা হচ্ছে নিরাপত্তায়ন (securitization) (গার্ডনার ও গেরহার্জ ২০১৬)। বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্র (nation-state) যেসব ধর্মীয় সম্প্রদায় ও জাতিগোষ্ঠীকে (ethnic group) নিয়ে গঠিত বলে ভাবা হয়, সেই 'কল্পিত জাতিসত্তার'

(imagined community) (এ্যান্ডারসন ২০০৬) মধ্যে বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের দেশের প্রতি আনুগত্য নিয়ে সন্দেহ হলে ক্ষমতাসীন দল বা সম্প্রদায় তাদেরকে জাতীয় নিরাপত্তার (national security) জন্য হুমকিস্বরূপ বলে দাবী করতে পারে। এবং সেই অজুহাতে তাদের জায়গাজমি আইনি কায়দায় বা রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করে জব্দ (confiscate) করে নেয়। এসব ক্ষেত্রে, অভিযুক্ত ধর্মীয় বা জাতিগত সম্প্রদায়কে সেই কল্পিত জাতিসত্ত্বার ধারণা থেকে বিযুক্ত বা বহিষ্কার করে এ ধরনের ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়ার যথার্থতা (justification) এবং বৈধতা (legitimacy) তৈরির চেষ্টা করা হয়। সরকারি নীতি ও আইনকানুন পরিবর্তন করে এবং প্রয়োজনমতো রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যবহার করে এ ধরনের নিরাপত্তায়নজনিত ভূমিগ্রাস পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এভাবে আইন আর সরকারি নীতির মারপ্যাঁচে একটা সমগ্র জাতিগোষ্ঠী বা ধর্মীয় সম্প্রদায়কে দেশের 'শত্রু' বানিয়ে দেয়া হয়।

নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণ দেখিয়ে রাষ্ট্র যেভাবে কোনো জনগোষ্ঠীর জমিজমা বাজেয়াপ্ত (confiscation) করতে পারে তা উপরোক্ত অধিগ্রহণ (acquisition) প্রক্রিয়া থেকে গুণগতভাবে ভিন্ন। এসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আইন, নীতি এবং শক্তিপ্রয়োগ ব্যবহার করে ভূমি বাজেয়াপ্ত করা হলেও যাদের জমি নেয়া হয় তাদের জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা থাকে না। কয়েকটি বাস্তব দৃষ্টান্তের আলোকে রাষ্ট্রের 'নিরাপত্তা'-র সন্দেহবোধ দিয়ে পরিচালিত এ ধরনের ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য আরো স্পষ্ট করা যায়।

১৯৬৫ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে একটা সংক্ষিপ্ত যুদ্ধ হয়। তারপর থেকেই পাকিস্তান রাষ্ট্র কর্তৃক সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশের প্রতি আনুগত্যের প্রশ্নে তাদের ভূমিসহ অন্যান্য সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ আমল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের সরকার 'শত্রু সম্পত্তি' বা 'অর্পিত সম্পত্তি' সংক্রান্ত আইন ও অধ্যাদেশ (order) জারি করে হিন্দুদের সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় এখতিয়ারে নিয়ে আসে।[২] অনেকক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু মুসলমানেরা প্রভাব খাটিয়ে তা দখল করে নেয়। পরবর্তীতে, বাংলাদেশ সরকার এ ধরনের আইন সংশোধন করে হিন্দু সম্প্রদায়ের জব্দ করা জমি ও সম্পদ তাদেরকে ফেরৎ দেয়া বা 'প্রত্যর্পণ' করার একটি উদ্যোগ নেয়।[৩] কিন্তু তা সত্ত্বেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেই প্রচেষ্টা আজ পর্যন্ত খুব একটা কার্যকর হয়নি।

এসব ক্ষেত্রে 'শত্রু সম্পত্তি' বা 'অর্পিত সম্পত্তি' সংক্রান্ত বৈষম্যমূলক (discriminatory) আইনগুলোকে হিন্দু সম্প্রদায়ের ভূসম্পত্তি কেড়ে নেয়ার 'পরিচ্ছন্ন আইনি কৌশল' হিসেবে রাষ্ট্রযন্ত্র ও সরকার ব্যবহার করেছে (গার্ডনার ও গেরহার্জ ২০১৬: ১১)।[৪] জাতীয় নিরাপত্তার নামে দেশের সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়কে 'জাতির শত্রু' বানিয়ে রাষ্ট্র তাদের জমিজমা গ্রাস করার প্রশ্নবিদ্ধ 'যথার্থতাও' (justification) তৈরি করার চেষ্টা করেছে (গার্ডনার ও গেরহার্জ ২০১৬: ১১)।

---

২. এইসব আইন ও অধ্যাদেশের মধ্যে রয়েছেঃ The Defense of Pakistan Ordinance; The Enemy Property (Custody and Registration) Order of 1965 and 1966; The East Palistan Enemy Property (Lands and Buildings) Administration and Disposal Order of 1966; The Bangladesh (Vesting of Propety and Assets) Order of 1972 (ফেল্ডম্যান ২০১৬: ৮-১০; ALRD 2015).

৩. এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য আইনের মধ্যে আছেঃ The Restoration of Vested Property Act 2001; The Enemy Property (Continuance of Emergency Provision) (Repeal) Act of 1974; The Vested Property Repeal (Amendment) Act, 2011.

৪. এসবক্ষেত্রে "ethnic belonging and nationalist exclusion are justifications for land grabs by the state" (গার্ডনার ও গেরহার্জ ২০১৬: ১১)।

নিরাপত্তায়নের (securitization) মাধ্যমে ভূমি গ্রাসের ভিন্ন ধরনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি আদিবাসীদের ক্ষেত্রে (খান ২০১৫: ২৫)। ১৯৭০-এর দশকের গোড়া থেকেই পাহাড়িরা তাদের নিজস্ব জাতিসত্ত্বা ও আত্মপরিচিতি (ethnic identity) এবং ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের সাথে দেনদরবার ও দরকষাকষি (negotiation) করে আসছিলো (মোহসীন ১৯৯৭; আদনান ২০০৪)। কিন্তু এক পর্যায়ে এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে পাহাড়িদের নেতৃত্বদানকারী সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং শান্তি বাহিনী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করে। এর ফলে সরকার এবং নিরাপত্তা বাহিনীর দৃষ্টিতে সমগ্র পাহাড়ি আদিবাসীরা বাংলাদেশ 'জাতিরাষ্ট্রের শত্রু' হিসেবে পরিগণিত হয়।

পাহাড়িদের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ-দমন রণনীতি (counter-insurgency strategy) অবলম্বন করা হয় তার একটি বিশিষ্ট কৌশল ছিলো রাষ্ট্রীয় প্রশাসন এবং নিরাপত্তা বাহিনীর মাধ্যমে পাহাড়িদেরকে তাদের ঘরবাড়ি ও জমিজমা থেকে উৎপাটিত করা। অনেক ক্ষেত্রেই যুদ্ধকালীন সহিংসতা ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে এই ভূমিগ্রাস ঘটে। এ কাজে নিয়োজিত সরকারি সংস্থাগুলো অধিকৃত জায়গাজমির ওপর পাহাড়িদের পূর্বতন (pre-existing) ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত (common) অধিকার (property rights) সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে (আদনান ও দস্তিদার ২০১১: ৬২-৬৪; আদনান ২০০৪: ৪৭-৫১)।

উপরন্তু, এই রাজনৈতিক ও সামরিক কৌশলের অংশ হিসেবে উচ্ছেদকৃত পাহাড়িদের পরিত্যক্ত জমিজমা জোর করেই পুনর্বণ্টন করে দেয়া হয় পার্বত্য চট্টগ্রামে আগমনকারী (in-migrating) বাঙালী বসতিস্থাপনকারী (settler) জনসমষ্টিকে, অথবা অনিবাসী (absentee) এবং শহরবাসী প্রভাবশালী মহলের (elites) মধ্যে। এভাবে ভূমিগ্রাস করার সময় রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পাহাড়িদের ঐতিহ্যলব্ধ (traditional) ভূমি অধিকার প্রায় সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে (রায় ১৯৯৫; মোহসীন ১৯৯৭; আদনান ২০০৪; আদনান ও দস্তিদার ২০১১; খান ২০১৫)। পাহাড়িদের প্রথাগত জুমচাষ ও বনজসম্পদ সংগ্রহের এলাকাগুলো এভাবে পরিণত করা হয় বাঙালী সেটলারদের ঘরবাড়ি ও চাষবাসের জমিতে, কিংবা নগরবাসী প্রভাবশালীদের রাবার, কাঠ ও ফলমূলের বাগানে (plantation) (আদনান ২০০৪: ৪২-৪৩; আদনান ও দস্তিদার ২০১১: ৭৭-৮১)। বহিরাগত বাঙালিদের কাছে পাহাড়িদের জায়গাজমি নির্বিঘ্নে হস্তান্তর করার জন্য তদানীন্তন সরকার তাদের অধিকার রক্ষাকারী আইনকানুন একতরফাভাবে বাতিল বা পরিবর্তন করে দেয়। বিশেষ করে, ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিকে (CHT Regulation of 1900) ১৯৭১ এবং ১৯৭৯ সালে যথাক্রমে তদানীন্তন পাকিস্তানী ও বাংলাদেশী সরকার গুরুতরভাবে পরিবর্তন করে। তার ফলে বাঙালিদের কাছে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জমি হস্তান্তর করার ক্ষেত্রে আগের আইনি রক্ষাকবচগুলো অনেকাংশে সরিয়ে ফেলা হয় (আদনান ২০০৪: ৪১)।

বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক প্রত্যক্ষ বলপ্রয়োগ

রাষ্ট্রীয় শক্তি দিয়ে ভূমি দখলের পর এখন বেসরকারি সংস্থা বা গোষ্ঠী কিভাবে ভূমিগ্রাস করার জন্য নিজেরাই বলপ্রয়োগ করে তা তুলে ধরা দরকার। এধরনের ভূমিগ্রাসকারীদের মধ্যে রয়েছে ধর্মীয় ও জাতিগত সম্প্রদায়ের কিছু অংশ, ক্ষমতাবান শ্রেণি ও আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠী, প্রাইভেট কোম্পানী ও কর্পোরেশন, 'বাণিজ্যিক এনজিও' (NGO), রাজনৈতিক প্রভাবশালীবৃন্দ এবং মাস্তান বাহিনী ও অপরাধচক্র (criminal mafia) (ফেল্ডম্যান ও গেইসলার ২০১২: ৯৮২; আদনান ও দস্তিদার ২০১১: ৮৮-৯৪; আদনান ২০১৩; গার্ডনার ও গেরহার্জ ২০১৬: ১১)। এসব দখলদারেরা সুবিধামতো পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা পাওয়ার ব্যবস্থা করতেও সিদ্ধহস্ত।

এ ধরনের বেসরকারি ভূমিগ্রাস বাংলাদেশে বহুদিন থেকেই ঘটে আসছে। বড় বড় নদীর চর ভূমিতে এবং প্রত্যন্ত অববাহিকা অঞ্চলে লাঠিয়ালদের জোরে ভাগচাষীদের বসানোর জন্য নিরন্তর জমি বেদখল করা এদেশের ভূমি সংঘাতের ইতিহাসের অংশ (আদনান ও মনসুর ১৯৭৭; ডে উইল্ড ২০১১; আদনান ২০১৩: ১০১)।

শক্তি প্রয়োগ করে ভূমিগ্রাস করার ক্ষেত্রে সাম্প্রতি নতুন ধরনের ব্যবসায়িক উদ্যোগ যোগ হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ: নয়াউদারবাদী বিশ্বায়নের প্রভাবে রপ্তানীর লক্ষ্যে এদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে নোনাজলের চিংড়ী উৎপাদনের জন্য সহিংস (violent) কায়দায় 'ঘের দখলের' প্রচলন ঘটেছে (আদনান ২০১৩: ১০৫-১১০; পাপরকী ও কন্স ২০১৪)। প্রভাবশালী চিংড়ীঘের মালিকেরা মাস্তানবাহিনী দিয়ে জোর করে উপকূলীয় এলাকার বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ কেটে লবণপানি ঢুকিয়ে দেয়ার কৌশল অবলম্বন করে। এর ফলে স্থানীয় চাষীদের মিষ্টিপানির ফসল উৎপাদন বানচাল হয়ে যায়। তখন তারা নিরুপায় হয়ে নিজেদের ফসলী জমি চিংড়ী ঘেরের জন্য নামমাত্র খাজনায় ('হাঁড়ির' টাকায়) ক্ষমতাশালী ঘের মালিকদের কাছে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। একবার চিংড়ী ঘেরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলে সেই জমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আর কখনই আগের কৃষকদের হাতে ফিরে আসতে পারে না।

এছাড়া, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জলাভূমি (wetlands) যেমন, হাওর, বাওড়, জলাশয়ের ভূমিগ্রাস করার প্রচেষ্টা অনেকদিন থেকেই চলমান (ফেল্ডম্যান ও গেইসলার ২০১২: ৯৮৪)। এ ধরনের জলাভূমি সাধারণত রাষ্ট্রীয় মালিকানার খাসজমি হলেও এগুলো ব্যক্তিগত ইজারাতে নেয়া কিংবা দখলি সত্ত্বের (possession) আওতায় আনার জন্য প্রভাবশালী মহল অত্যন্ত উদগ্রীব। এজন্য তারা প্রয়োজনমতো মাস্তান বাহিনী ব্যবহার কিংবা অন্যান্য অবৈধ কায়দায় জলাভূমি নিজেদের করায়ত্ত্ব করে। পুলিশ প্রশাসনকে নানা প্রলোভনের মাধ্যমে এ ধরনের বেআইনি দখলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া থেকে বিরত রাখার ব্যবস্থা করে এসব প্রভাবশালী মহল।

শুধু প্রত্যন্ত চরাঞ্চল বা জলাভূমি নয়, রাষ্ট্রযন্ত্রের জ্ঞাতসারে শহর এলাকাতেও ভূমি বেদখলে সক্রিয় রয়েছে বিভিন্ন প্রভাবশালী গোষ্ঠী। তথাকথিত 'উন্নয়নের' সাথে তাল মিলিয়ে শহরের জমির দামও বাড়ছে। আধুনিক ফ্ল্যাটবাড়ি, বিপনি বিতান ও 'শপিং মল' ইত্যাদিতে পুঁজি বিনিয়োগ করে ব্যবসার কিংবা ফটকাবাজীর (speculation) মুনাফার পরিমাণও বেড়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই শহরাঞ্চলের জমি বেদখল করার জন্য ভয়ভীতি প্রদর্শন, সহিংসতা এবং খুনখারাবি ঘটছে (ফেল্ডম্যান ও গেইসলার ২০১২: ৯৮২-৯৮৫)। ঢাকা মহানগরের করাইল কিংবা আগারগাঁওয়ের মতো বস্তীতে পরিকল্পিতভাবে আগুন ধরিয়ে দিয়ে বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ করে সেই জায়গাগুলো নতুন মার্কেট বা এ্যাপার্টমেন্টের জন্য বেদখল করার প্রচেষ্টাও আজকাল প্রায়ই দেখা যায়।

ওপরে আলোচিত দৃষ্টান্তগুলো মূলত শ্রেণিস্বার্থ দিয়ে পরিচালিত ভূমি গ্রাসের নমুনা। তবে, এগুলো ছাড়াও জাতি ও ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক সংঘাতের ছত্রছায়াতে ভূমি বেদখল প্রক্রিয়ার ভিন্ন দৃষ্টান্ত রয়েছে সমকালীন বাংলাদেশে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে রাষ্ট্রীয় ভূমি গ্রাসের পাশাপাশি বিভিন্ন বাঙালি ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠান পাহাড়িদের ভূমি বেদখলে ব্যাপকভাবে সক্রিয়। প্রভাবশালী সেটলার, বাগান মালিক (plantation owners), সরকারি কর্মকর্তা এবং অন্যান্য ক্ষমতাবান গোষ্ঠী নানাভাবে জোরজবরদস্তি করে পাহাড়ি আদিবাসীদের জায়গাজমি দখল করে নিয়েছে (আদনান ২০০৪: ৮৯-৯৪; আদনান ও দস্তিদার ২০১১: ৭১-৯৯)। এছাড়া,

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক আক্রমণ ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ হিন্দু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভূমিগ্রাস করেছে (বারকাত ও রায় ২০০৪: ২২৫-২৩১; ফেল্ডম্যান ২০১৬)। উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর, রংপুর, জয়পুরহাট, নওগাঁ, রাজশাহীসহ বিভিন্ন জেলায় স্থানীয় বাঙালিরা সশস্ত্র আক্রমণ এবং অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে মুন্ডা, সাঁওতাল, ওরাঁও এবং অন্যান্য আদিবাসী জাতির ভূমি জবরদখল করেছে (ডেইলি স্টার, ২১ জানুয়ারি ২০১৫)।

উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলো থেকে এটা প্রতীয়মান, এ ধরনের বেসরকারি ভূমি বেদখল প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দিয়েছে সমাজের বিত্তবান ও প্রভাবশালী শ্রেণি এবং প্রধান (dominant) ধর্মীয় ও জাতিগত সম্প্রদায়ের অংশবিশেষ। এটাও লক্ষণীয় যে ভূমিগ্রাসীদের আক্রমণ ও বলপ্রয়োগের সময় আক্রান্ত শ্রেণি, সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর মানুষেরা অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের প্রশাসনযন্ত্র ও নিরাপত্তাবাহিনীর কাছ থেকে যথাযথ সুরক্ষা পায়নি (আদনান ও দস্তিদার ২০১১)।

৫. বলপ্রয়োগের মাধ্যমে পরোক্ষ ভূমিগ্রাস

এ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ বা সরাসরি বলপ্রয়োগ করে ভূমি বেদখল প্রক্রিয়া আলোচনা করা হয়েছে। এখন আমরা দেখবো কিভাবে শক্তি প্রয়োগের প্রাথমিক লক্ষ্য অন্য কিছু হলেও তার ফলশ্রুতিতে শেষ পর্যন্ত মানুষ ভূমি হারাতে বাধ্য হয়। এ ধরনের ক্ষেত্রে ভূমি বেদখল প্রক্রিয়া পরোক্ষভাবে (indirectly) কাজ করে। রাষ্ট্রীয় নীতি এবং উন্নয়ন প্রকল্পের ঘটনাপরম্পরায় কিংবা সম্প্রদায়িক সংঘাতের অঘোষিত (undeclared) কিংবা অনির্ধারিত (unintended) পরিণতি হিসাবে এ ধরনের পরোক্ষ ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়া ঘটে থাকে।

এরকম একটি প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয় ১৯৯২ সনে যখন নয়া উদারবাদী বিশ্বায়নের প্রভাবে বাংলাদেশ সরকার চিংড়ী মহাল বিধি (Shrimp Zone Rules) প্রবর্তন করে। ২০০৩ সালে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন নোয়াখালী জেলায় চিংড়ী মহালের জন্য নির্ধারিত এলাকার ঘোষণা দেয় (আদনান ২০১৩: ১১৭-১২২)। লক্ষণীয় যে, রাষ্ট্রের উদ্যোগে স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও এই প্রকল্পের ঘোষিত লক্ষ্য রপ্তানির জন্য লবণজলের চিংড়ী উৎপাদন করা বাস্তবে সম্ভব হয়নি। কিন্তু চিংড়ী মহাল নীতিতে বাণিজ্যিক খামারের জন্য উদ্যোক্তা শ্রেণিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরকারি খাস জমি ইজারা দেবার ঘোষণা থাকার ফলে তাদের জন্য ভূমি দখল করার একটি অনুমোদিত পথ খুলে যায়।

উপরন্তু, বড় ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীসহ বিভিন্ন প্রভাবশালী মহল এই সুযোগে চরাঞ্চলের বিস্তৃত জমিতে চিংড়ী ঘের স্থাপনের অছিলায় সেখানে বসবাসরত ভূমিহীন ও নদী শিকস্তী পরিবারদের উচ্ছেদ করে তাদের জায়গাজমি দখল করে (আদনান ২০১৩)। একবার চরের জমির উপর দখল (possesion) স্থাপন করার পর তারা ক্ষমতাসীন সরকারের নেতা ও প্রশাসনের যোগসাজশে সেসব জমির বানোয়াট দলিলপত্র তৈরী করে আইনী মালিকানাসত্ত্ব (de jure ownership) অর্জন করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। এ সবের পরিণতিতে চরাঞ্চলে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে কৃষি ও মাছ চাষের (agribusiness ও agro-fisheries) জন্য অনেক বাণিজ্যিক খামার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ধরনের ভূমি গ্রাসের বিরুদ্ধে দরিদ্র ও ভূমিহীনেরা যে প্রতিরোধ আন্দোলন দাঁড় করাতে চেষ্টা করে সেটা প্রভাবশালী দখলদারেরা লাঠিয়াল বাহিনীর মাধ্যমে দমন করে (আদনান ২০১৩ : ১০৫-১১৫)।

এখানে উল্লেখ্য যে, যেসকল নয়া উদারবাদী নীতির বরাত দিয়ে বাংলাদেশে চিংড়ী মহাল স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয় সেগুলো প্রবর্তিত হয়েছিলো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রক (regulatory) প্রতিষ্ঠান ও দাতা সংস্থার চাপে (ওয়াকার ২০০৮: ৫৭৩-৫৭৪; আদনান ২০১৩: ১০৫-১০৬)। এসব আন্তর্জাতিক ব্যাংক ও নীতিনির্ধারক সংস্থার ঘোষিত লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থাকে নয়া উদারবাদী পথে পরিচালিত করা এবং সেই নিমিত্তে চিংড়ী রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার উপার্জন বাড়ানো। কিন্তু তাদের এই নীতির বাস্তবায়নের সময় যে ব্যাপক ভূমি দখল ঘটে সেটা তাদের ঘোষিত লক্ষ্যের মধ্যে ছিল না। সেজন্য চিংড়ী মহাল স্থাপন করার ঘটনাপরম্পরায় যে ভূমিগ্রাস ঘটে তাকে একটি পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া হিসাবে অভিহিত করা যায়।

শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পরোক্ষ ভাবে ভূমিগ্রাসের আরেকটি পন্থা হচ্ছে সামাজিকভাবে দুর্বল সম্প্রদায়, শ্রেণি বা জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরিকল্পিতভাবে আতংক ও অনিশ্চয়তা (insecurity) সৃষ্টি করা। এভাবে তাদেরকে নিজেদের জায়গাজমি ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য করাই এই কৌশলের চূড়ান্ত লক্ষ্য (আদনান ও দস্তিদার ২০১১; আদনান ২০১৬)।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের (Partition) সময় থেকে ধর্মীয় সংঘাত এবং দাঙ্গার ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকেই তাদের জমিজমা ফেলে, কিংবা নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করে, দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। অনুরূপ সাম্প্রদায়িক সহিংসতা এবং অনিশ্চিয়তা সৃষ্টির প্রক্রিয়া এখনও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘটে চলেছে। এর ফলে হিন্দু, বৌদ্ধ, আদিবাসী এবং অন্যান্য ধর্মীয় ও জাতিগত (ethno-religious) সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী নিরাপত্তাহীনতার কারণে তাদের জায়গাজমি ছেড়ে ক্রমাগতভাবে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

এ ধরনের সাম্প্রদায়িক শঙ্কা ও আতংক সৃষ্টি করার একটা প্রচলিত পন্থা হলো ভিন্নধর্মী মানুষের উপাসনালয় কিংবা ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ওপর হামলা করা। এর সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় কক্সবাজার জেলার রামু ও উখিয়ায় ২০১২ সালের ৩০ শে সেপ্টেম্বর রাত্রি থেকে পরবর্তী ৩৬ ঘন্টায় পর্যায়ক্রমে কয়েক ডজন বৌদ্ধ মন্দির ও বৌদ্ধ মূর্তিস্থাপনা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া কিংবা ভাঙ্গচুর করার ঘটনায় (বড়ুয়া ২০১৩:৩৪০-৩৪৪)। এই পরিকল্পিত ধ্বংসযজ্ঞের পর আক্রান্ত এলাকার সমগ্র বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে অনিশ্চয়তা তীব্রভাবে বেড়ে যায়। অনেক পরিবারই নিরাপত্তার খাতিরে নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে অন্যত্র চলে যান কিংবা চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেন।

এভাবে ধর্মীয় উপাসনালয় আক্রমণ করে ভূমিগ্রাসের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার দৃষ্টান্ত আরও আগে থেকেই দেখা যায়। কয়েক বছর ধরে হুমকি দেয়ার পর ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাজেক ইউনিয়নে অবস্থিত বাঘাইহাট নিকটবর্তী বৌদ্ধদের বনানী মৈত্রী বনবিহার জোর করে পুড়িয়ে দেয়া হয় (আদনান ও দস্তিদার ২০১১: ৭৩-৭৪)। এই বৌদ্ধবিহার সংলগ্ন আশেপাশের জায়গাগুলো বাঙালী বসতিস্থাপনকারীরা (settlers) অনেক দিন থেকেই বেদখল করার চেষ্টা করছিলো। স্থানীয় প্রশাসন ও নিরাপত্তাবাহিনীর নাকের ডগাতে এই আক্রমণ ঘটলেও বৌদ্ধমন্দিরটি রক্ষা করার জন্য কোন কার্যকর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। বস্তুত, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্থাপনার ওপর আক্রমণ বাংলাদেশে সাম্প্রতিক কালে প্রায়ই ঘটছে । ২০১০ সালের ছয়মাস ধরে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সংখ্যালঘুদের ওপর সংঘটিত আক্রমণের তথ্য বিশ্লেষণ করে গৌতম (২০১৫:৭৫-৮২) দেখিয়েছেন যে অনেক ক্ষেত্রেই সাম্প্রদায়িক আক্রমণের ফলশ্রুতিতে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ভূমিগ্রাস করা হয়েছে।

সামাজিক আতংক ও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে ভূমিগ্রাস করার আরও একটি বহুলপ্রচলিত পন্থা হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে কোনো গোষ্ঠীর নারীদের ওপর যৌন হামলা ও হয়রানী করা। মহিলাদেরকে নিশানা করে যৌন আক্রমণ ও ধর্ষণ করা হলে তাঁদের নিকট আত্মীয়স্বজন এবং সমগ্র সম্প্রদায়ই আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই ধরনের আতঙ্ক আরও ঘনীভূত হয় যদি সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের শাস্তি দেয়া না হয়, এবং তারা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিচারের আওতার বাইরে দায়মুক্তি উপভোগ করতে থাকে।

এধরনের যৌন হামলার শিকার যেসব নারীরা, এবং তাঁদের পরিবার ও সম্প্রদায়, সকলকেই নিজেদের ইজ্জত বা মানসম্মান হারানোর আতঙ্ক ও আশঙ্কা নিয়ে দিন কাটাতে হয় (সর্বজনকথা ২০১৪:৫-৬)। এহেন সামাজিক চাপের মুখে কোনা এক পর্যায়ে তাঁরা ভিটেমাটি ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলে তাদের জমিজমা হামলাকারীসহ অন্যান্য প্রভাবশালীরাও বেদখল করে থাকে। ২০১৪ সালের ৪ আগষ্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জের আদিবাসী নেত্রী বিচিত্রা তির্কীর ওপর স্থানীয় বাঙালী দখলকারীদের আক্রমণ অনুরূপ একটি ঘটনা। নারীদের ওপর এ ধরনের যৌন হামলা বর্তমান বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে ঘটছে, যার আড়ালে অনেক ক্ষেত্রে ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়াও প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করে চলেছে (মোহসীন ১৯৯৭: ১৭৮; আদনান ও দস্তিদার ২০১১: ৯৬-৯৭; সর্বজনকথা ২০১৪: ৫-৬)।

যখন কোন সম্প্রদায়ের জায়গাজমি দখল করার উদ্দেশ্যে তাদের ওপর নানা ধরনের হামলা করা হয়, তখন সেটাকে বৈধতা দিয়ে সাফাই গাওয়ার প্রচেষ্টাও লক্ষ্য করা যায়। এ ক্ষেত্রে যাদের জমিজমা নিশানা (target) করা হয় সেই গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে ভূমিদখলকারীরা নানাভাবে নিজেদের থেকে ভিন্ন (other) কিংবা 'শত্রু' স্থানীয় হিসাবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করে (ফেল্ডম্যান ও গেইসলার ২০১২; ফেল্ডম্যান ২০১৬)। এ ধরনের 'ভিন্নকরণ' (othering) প্রক্রিয়া সৃষ্টি এবং প্রচার করা হয় নানাভাবে, যার মধ্যে রয়েছে সামাজিক মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, শিক্ষাব্যবস্থা এবং মতাদর্শের বিকৃত প্রয়োগ। বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয়, জাতিগত, ভাষাগত, কৃষ্টিগত, এবং অন্যান্য সাম্প্রদায়িকতা এই 'ভিন্নকরণ' ও 'শত্রু-উৎপাদন' প্রক্রিয়ার মালমসলা হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

৬. বল প্রয়োগ ছাড়াই প্রত্যক্ষ ভূমি দখল

এরপর দেখা যাক শক্তি প্রয়োগ না করেও কি কি ভাবে ভূমি দখল করা হয়েছে সমকালীন বাংলাদেশে। এ সব ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রক্রিয়ার মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু শক্তিপ্রয়োগ করা হয় না, সেহেতু এই প্রক্রিয়াগুলো এমনভাবে পরিচালিত হয় যাতে কোনো প্রকাশ্য বিরোধ না ঘটে। যারা ভূমি হারান তাদের অজ্ঞাতসারে, কিংবা আপোষের মাধ্যমে, ভূমি দখল করা হয়। এই ধরনের বিভিন্ন পদ্ধতি নীচে আলোচনা করা হলো।

এরকম ভূমি হস্তান্তর প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে সম্পত্তির মালিকানা বা দখলীসত্ত্ব কেনা, অথবা শর্তসম্বলিত চুক্তিতে জমি ইজারা (lease) নেয়া। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বাংলাদেশের কয়েকটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ) স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জমি বাজারের মাধ্যমে কেনার দাবী করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন ও আবাসন কোম্পানী (প্রথম আলো ২৮ জুলাই ২০১৬)।[৫] তাছাড়া নানা ধরনের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রকল্পের জন্যও জমি কেনার হিড়িক পড়েছে দেশের বিভিন্ন নগর ও বাণিজ্যিক এলাকা এবং

৫. অবশ্য বাস্তবে এসব জমি 'কেনা' বা 'ভাড়া' নেয়ার সময় কোনো ধরনের বলপ্রয়োগ করা হয়েছিলো কিনা তা উদ্বৃত সংবাদ সূত্রে বলা হয়নি। আমাদের পক্ষেও সব ক্ষেত্রে এরকম ঘটনা সরেজমিনে পরখ করা সম্ভব হয়নি।

শিল্পাঞ্চলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ: সুন্দরবনের চারপাশের রক্ষিত এলাকায় ইতিমধ্যেই আনুমানিক ৩০০টি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রায় ১০ হাজার একর জমি কেনা হয়েছে (সর্বজনকথা ২০১৬: ৪)। এসব জমির ক্রেতাদের মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক প্রভাবশালী নেতাকর্মী এবং বিভিন্ন বাণিজ্যিক গোষ্ঠী (প্রথম আলো, ১৩ জুলাই ২০১৭)।

এ ছাড়া, দখলীসত্ত্বের (right of possession) কোন আইনী স্বীকৃতি না থাকলেও বাস্তবে এ ধরনের ভূমি সত্ত্ব খোলাখুলি বেচাকেনা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দখলীসত্ত্বের সক্রিয় ভূমি বাজার বিদ্যমান। নোয়াখালীর চরাঞ্চলে ভূমিদস্যুরা তাদের করায়ত্ত্ব জমির দখলীসত্ত্ব বিক্রি করে থাকে বিভিন্ন বাণিজ্যিক বা শিল্প সংস্থার কাছে (আদনান ২০১৩: ১১৬)।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান জেলায় সরকারি প্রশাসন থেকে বাঙালি বসতিস্থাপনকারীদেরকে (settlr) 'আর-হোল্ডিং' (R-Holding) নামে যে কবুলিয়ৎ দলিল দেয়া হয়েছিলো সেগুলো তারা অনেকেই পরবর্তীতে বিক্রি করে দেয়। তারপর থেকে এই ভূমিসত্ত্বের সনদগুলো (titles) অবাধে কেনাবেচার সাক্ষ্য দিয়েছেন বম্ নেতা জুম লিয়ান আমলাই (আদনান ও দস্তিদার ২০১১:৬৫-৭০)। বিশেষ করে কয়েকটি কোম্পানী, ব্যবসায়িক এনজিও (NGO) এবং ভূমি দখলদারেরা এই রাষ্ট্রপ্রদত্ত ভূমিসত্ত্বের সনদ কিনে নিয়েছে এবং তা দিয়ে বসবাসকারী পাহাড়ি ও বাঙালি উভয়ের ভূসম্পত্তির ওপর মালিকানা দাবী করছে।

সরাসরি বলপ্রয়োগ না করে ভূমি বেদখলের আরেকটি পন্থা হচ্ছে জমির দলিলপত্র ও রেকর্ড জাল করা কিংবা অবৈধভাবে বদলে দেয়া (বারকাত ও রায় ২০০৪: ১৯২-২২৪)। ভূমিগ্রাসীরা সাধারণত প্রভাব খটিয়ে ও ঘুষ দিয়ে তহশিলদার, দলিল লেখক, এবং ভূমি অফিসের কর্মচারীদের যোগসাজশে এ ধরনের জাল দলিলপত্র বানায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভূমির আসল মালিকদের অজান্তেই এমন জালিয়াতি ও প্রতারণা ঘটে থাকে। ভুয়া দলিলপত্র তৈরী করার জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় সংঘবদ্ধ অপরাধচক্র পরিচালিত ব্যবসা চালু আছে। ক্ষেত্রবিশেষে ভূমি অফিসে চাকুরীরত কিংবা অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তারাও এসব অপরাধচক্রে জড়িত থাকে। এরকম জাল ভূমিসত্ত্ব কেনাবেচার সংঘবদ্ধ কার্যক্রমের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নোয়াখালী জেলা (আদনান ২০১৩: ১১৬) এবং পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে (আদনান ও দস্তিদার ২০১১: ১০০-১০১)।

এমনকি, ঢাকা মহানগরের উপকণ্ঠে অবস্থিত গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈরে একটি অপরাধচক্র বিভিন্ন আবাসন কোম্পানীর প্রতিনিধিদের নামে প্রায় ১৫০ একর জমি জালিয়াতি করে রেজিষ্ট্রি করে নিয়েছে। এটি সম্ভব হয়েছে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারী, জমির দালাল এবং দলিল লেখকদের যোগসাজশে (প্রথম আলো ৮ নভেম্বর ২০১২)। এছাড়া, গাজীপুর জেলারই শ্রীপুর উপজেলায় তিনটি গ্রামের সাধারণ মানুষের প্রায় হাজার খানেক একর জমি জালিয়াতি করে বেদখল করা হয়েছে চারটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের নামে। এই অবৈধ ভূমি দখল করা হয় স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের ওপর প্রভাব খাটিয়ে এবং প্রয়োজনমত ঘুষ দিয়ে (আইন ও সালিশ কেন্দ্র এবং অন্যান্য ২০১৪; সর্বজনকথা ২০১৫: ৭-৮)। নানা ধরনের জালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ এবং জলনিয়ন্ত্রক অবকাঠামোর সরকারি জায়গাজমি প্রভাবশালীরা বেদখল করেছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে (ফেল্ডম্যান ও গেইসলার ২০১২: ৯৮২)।

কোনো বিরোধ ছাড়া নির্বিঘ্নে ভূমি দখল করার আর একটি চতুর কৌশল হচ্ছে জনমত প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করা। এ জন্য 'দেশ ও জাতির উন্নয়নের জন্য ভূমি প্রদান করা দরকার' বলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে

প্রচার করা হয় এবং ছলেবলে কৌশলে কোনো প্রতিরোধ করা থেকে তাঁদেরকে বিরত রাখা হয়। দেশী-বিদেশী উদ্যোগে বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করার সময় সাধারণ মানুষের মগজধোলাই করার জন্য এ ধরনের বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা হয়।

এ প্রক্রিয়ার একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সিলেটের বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্রের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের পর এলাকাবাসীর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সামাল দেয়ার কলাকৌশলে। যদিও শেভরন (Chevron) নামের বহুজাতিক কোম্পানী মুনাফা বানানোর জন্যেই গ্যাস উত্তোলন করছে, তবু তারা বিবিয়ানার স্থানীয় মানুষকে নানভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে যে এ প্রকল্পটি বাংলাদেশের 'জাতীয় উন্নয়নের' জন্য অপরিহার্য। উপরন্তু, এ প্রকল্পের জন্য প্রাপ্ত ভূমির 'প্রতিদান' হিসাবে তারা এলাকাবাসীর জন্য সামান্য কিছু স্কুল, প্রশিক্ষণ ও সেবামূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা করেছে, এবং সেগুলোকে 'উন্নয়নের উপহার' (development gift) হিসাবে এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে সম্প্রচার করেছে (গার্ডনার ও অন্যান্য ২০১৪: ৮; গার্ডনার ও গেরহার্জ ২০১৬: ৯; আহাসান ও গার্ডনার ২০১৬)।

এ ধরনের 'উপহারের রাজনীতির' ('politics of the gift') মাধ্যমে এই কোম্পানী তাদের ভূমি বেদখল কার্যক্রমকে বৈধতা (legitimacy) প্রদান করার চেষ্টা করেছে। উপরন্তু, এলাকাবাসীকে 'আধুনিকতা এবং উন্নয়নের ভ্রান্ত স্বপ্ন দেখিয়ে' তাদেরকে গ্যাসক্ষেত্র প্রকল্পের বিরোধিতা না করে বরং সহযোগিতা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

লক্ষণীয় যে, এসব কর্মকাণ্ড এবং উন্নয়ন-সংক্রান্ত প্রচারণা জোরদার করার জন্যে শেভরন কর্পোরেশন জাতীয় ও স্থানীয় বেসরকারি কয়েকটি সংস্থার (NGO) সাথে 'অংশীদারিত্বের' (partnership) চুক্তি সম্পাদন করে। এভাবে, নিজেদের কোম্পানীর ভাবমূর্তিটাকে 'উন্নয়ন ও জনকল্যাণ সহায়তার মোড়কে মুড়ে' তারা নিজেদের কর্মকাণ্ডকে 'নতুন ছাপ' (rebranding) দেয়ার চেষ্টা করে। তাছাড়া, বিভিন্ন ধরনের জনসংযোগ (public relations) ও বিজ্ঞাপন (advertising) প্রচারের মাধ্যমে শেভরন এসব উদ্দেশ্যপ্রণোদিত 'জনসেবামূলক' কর্মকাণ্ডকে নিজেদের 'কর্পোরেট কার্যক্রমের সামাজিক দায়বদ্ধতার' (corporate social responsibility or CSR) নির্দশন হিসেবে তাদের বিদেশী শেয়ার মালিক এবং বাংলাদেশী নীতিনির্ধারকদের কাছে উপস্থাপন করেছে (গার্ডনার ও অন্যান্য ২০১৪: ৬-৭ ; গার্ডনার ও গেরহার্জ ২০১৬: ৭-১০)।

উল্লেখ্য যে, শেভরন এলাকাবাসীকে যেসব সুবিধা দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো তার মধ্যে বেশ কয়েকটি দেয়ার ক্ষমতা কিংবা ইচ্ছা কোনোটাই তাদের ছিলো না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, স্থানীয় অধিবাসীদের পাইপের মাধ্যমে গ্যাস সংযোগ দেয়া কিংবা এ এলাকায় কারখানা ও বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা, কোনোটাই এ বিদেশী কোম্পানীর এখতিয়ারে ছিলো না (গার্ডনার ও অন্যান্য ২০১৪: ৩)। এ সত্ত্বেও এসব মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে স্থানীয় মানুষের সম্ভাব্য প্রতিরোধ নিবৃত করে তাঁদের সহযোগিতা পাওয়ার জন্য কর্পোরেশনটি এ ধরনের পরিকল্পিত প্রতারণার কৌশল অবলম্বন করেছিলো।

এভাবে বিতর্কিত উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ভূমিগ্রাসের পক্ষে জনমতকে প্রভাবিত ও বিভ্রান্ত করার আরও দৃষ্টান্ত বর্তমানে বাংলাদেশে দেখতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সুন্দরবনের জন্য ক্ষতিকারক রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের স্থাপনাকে বৈধতা দেয়ার জন্যে টিভি ও অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী বিজ্ঞাপন ও সাজানো কথোপকথনের (talk show) কৌশলী ব্যবহার লক্ষণীয়।

৭. বল প্রয়োগ ছাড়া পরোক্ষ প্রক্রিয়ায় ভূমি দখল

ভূমি দখলের এ বিশেষ প্রক্রিয়াটি সহজে চোখে পড়ে না। কেননা, এসব ক্ষেত্রে কেউ সরাসরি বলপ্রয়োগ করে না এবং জমি হারানোর ঘটনাগুলো ঘটে পরোক্ষভাবে, অর্থাৎ অন্য কোনো উদ্দেশ্যে পরিচালিত কাজের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবে। কয়েকটি বাস্তব দৃষ্টান্ত নিয়ে আলোচনা করলে এ প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত ধারণাটি পরিষ্কার হবে।

বাংলাদেশের বহু অঞ্চলে বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধ, স্লুইস (sluice), পোল্ডার (polder) জাতীয় অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে। দেশের সরকার ও বিদেশী দাতাসংস্থার উদ্যোগে এই অবকাঠামোগুলো তৈরীর মূল উদ্দেশ্য ছিলো জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বন্যা থেকে জনবসতি এবং কৃষি জমি রক্ষা করা (আদনান ও অন্যান্য ১৯৯২; ১৯৯৪)। কিন্তু, অনেক ক্ষেত্রেই এই বন্যা রক্ষাব্যবস্থা পরিকল্পনামতো কাজ করেনি। ত্রুটিপূর্ণ বাঁধের ভাঙনের ফলে পরিকল্পনা অনুযায়ী যেসব এলাকা 'রক্ষিত' থাকার কথা ছিলো সেরকম জায়গাতেও বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অথবা স্লুইস অকেজো হয়ে যাওয়ায় পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ হয়ে গেছে এবং দেখা দিয়েছে জলাবদ্ধতা (আদনান ১৯৯১: ৬২-৭২) যশোরের ভবদহ স্লুইসের গেটগুলো অচল হয়ে যাওয়ায় ব্যাপক জলাবদ্ধতা ঘটেছে স্থাপনাটির চারিদিকে। ১৯৯০ এর দশকে বিল ডাকাতিয়ার পোল্ডারে সারা বছর ধরে পানি জমে থাকা এরকম অপরিকল্পিত ও ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়ার দৃষ্টান্ত (আদনান ১৯৯১; ১৯৯২; ১৯৯৪; ২০১৬খ)। এসব বন্যাকবলিত কিংবা জলাবদ্ধতায় আটকে যাওয়া জনগোষ্ঠী অভাবের তাড়নায় তাদের জমিজমা বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছে।

এ ধরনের জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কোনো দখলদারের বল প্রয়োগের প্রয়োজন হয়নি (ফেল্ডম্যান ও গেইসলার ২০১২; আদনান ২০১৬খ)। যদিও বন্যাকবলিত মানুষ অভাবের তাড়নায় নিজ জমি থেকে উৎপাটিত হয়েছে, তা ঘটেছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের ব্যর্থতার পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হিসাবে। যেহেতু বন্যানিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য ছিলো ভূমিগ্রাস থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, সেজন্য এই ভূমি হস্তান্তর প্রক্রিয়াকে পরোক্ষ হিসাবে গণ্য করতে হয়।

অনুরূপ পরোক্ষ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের বহু অঞ্চলের জনগোষ্ঠী ভূমি হারিয়েছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং অন্যান্য শহরে অপরিকল্পিতভাবে পূর্বেকার খাল, নর্দমা ও জলনিষ্কাশন পথগুলো বন্ধ করে দেয়ার ফলে সৃষ্টি হয়েছে জলাবদ্ধতা। অনেক ক্ষেত্রেই এসব এলাকার ভূমি মালিকেরা তাদের জমি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছে (আদনান ১৯৯১: ৭৩-৭৫; গার্ডনার ও গেরহার্জ ২০১২)। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ডেভেলপার কোম্পানী এবং ফটকাবাজেরাই এ ধরনের জলাবদ্ধ জমি কিনে তার সংস্কার করে পরবর্তীতে অন্যদের কাছে তা বিক্রি করেছে প্রচুর মুনাফাসহ।

ভূমিগ্রাসের কোনো সচেতন বা পূর্বতন উদ্দেশ্য না থাকলেও বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট সংকটের কারণে এরকম বিপর্যয় ঘটে। ফলে ক্ষয়ক্ষতি ও জীবিকার সংকট সৃষ্টি হয়। এমন অবস্থায় নিতান্ত বাঁচার তাগিদে এলাকাবাসী মানুষকে তাদের শেষ সম্বল ভিটেমাটি ও জমিজমা বাধ্য হয়ে বিক্রী করে দিতে হয় ('distress sale') (আদনান ২০১৬ খ)।

৮. উপসংহার: ভূমিগ্রাস ও ধনার্জন

ওপরের আলোচনায় বাংলাদেশে ভূমি বেদখল প্রক্রিয়া ও কলাকৌশলের বৈচিত্র্য তুলে ধরা হয়েছে। একদিকে শক্তির ব্যবহার থাকা বা না থাকা, অন্যদিকে প্রক্রিয়াটি প্রত্যক্ষ না পরোক্ষ, এই বৈশিষ্ট্যগুলো

সমন্বিত করে চার ধরনের ভূমি দখল প্রক্রিয়ার একটি প্রাথমিক ছক তৈরী করা হয়েছে। এবং বাস্তব দৃষ্টান্তের মাধ্যমে প্রত্যেক ধরনের প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বড় ধরনের এ প্রকারভেদের (typology) প্রতিটি প্রক্রিয়াকে আরও সূক্ষ্মভাবে বিভাজন করা যায় কোনো বিশেষ ঘটনার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। যেমন ওপরের আলোচনায় প্রত্যক্ষ বল প্রয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভিন্ন ভিন্ন কায়দা ও ভূমিকার তফাৎ দেখানো হয়েছে।

তবে বলা দরকার যে, যদিও এক এক ধরনের ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়া আলাদাভাবে আলোচনা করা হয়েছে, বাস্তবে একাধিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি একইসাথে কাজ করতে পারে। অনুরূপভাবে, ভূমিগ্রাসে একাধিক প্রতিষ্ঠানও জড়িত থাকতে পারে যেগুলোকে সমন্বিত করে প্রধান দখলকারী শক্তি বা সংস্থা। ভূমি বেদখলের আরও জটিল ঘটনাগুলোতে একাধিক পদ্ধতি ব্যবহার করে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান একযোগে কাজ করে। সিলেটের বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্রে, এবং সাম্প্রতিককালে বাঁশখালির বিদ্যুৎকেন্দ্রে এবং গোবিন্দগঞ্জে সাঁওতালদের উচ্ছেদ করে জমি জবরদখল করা এ ধরনের বহুমাত্রিক (multi-dimensional) ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়ার নিদর্শন।

লক্ষণীয় যে, ভূমিগ্রাস সবক্ষেত্রে বিনা বাধায় ঘটতে পারে না। বাস্তবে এগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ (resistance) ও সংগ্রাম (struggle) হতে পারে। যেসব জনগোষ্ঠী বা শ্রেণির জমিগ্রাস করা হয়, কিংবা যাদের জমি হারানোর আশঙ্কা থাকে, তারা নিজেদের জায়গা রক্ষা বা পুনরুদ্ধার করার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে (আদনান ২০১৩:৯৭-৯৮)। এসব ক্ষেত্রে দখলদার এবং প্রতিরোধী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সহিংস সংঘাত ছাড়াও দরকষাকষি (negotiation), সালিশী, আদালতে মামলা, অথবা পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে আপোষ করা, এরকম বিভিন্ন ধরনের পরিণতি ঘটতে পারে।

ভূমি সংঘাতে লিপ্ত প্রতিটি পক্ষই নিজেদের অবস্থানকে সঠিক বলে ঘোষণা করে এবং নিজস্ব দাবী প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এসব পরস্পরবিরোধী ভূমি অধিকারের মধ্যে বৈধতা (legitimacy) স্থাপনের সংগ্রামও চলে। এ কারণে ভূমি অধিকার নিয়ে সংঘাতের (struggle) রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক ছাড়াও সামাজিক ও মতাদর্শিক (ideological) মাত্রাও (dimension) গুরুত্বপূর্ণ। ভূমিগ্রাসের এই প্রতিটি মাত্রার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে বিশ্লেষণের আওতায় আনা দরকার।

ওপরের আলোচনা থেকে এটা প্রতীয়মান যে, ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রযন্ত্র বিভিন্ন ও বহুমুখী ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন অংশ যথা, নির্বাহী প্রশাসন (executive), আইনসভা (legislature), এবং বিচারব্যবস্থা (judiciary) কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী অবস্থান নিতে পারে (আদনান ২০১৩; ১১৪- ১১৫; ২০১৪: ১৭)। এছাড়া, যে সার্বিক ক্ষমতা কাঠামো (power structure) রাষ্ট্র, সমাজ ও শ্রেণিবিন্যাসকে নিয়ন্ত্রণ করে, ভূমিগ্রাসের ক্ষেত্রে তার প্রভাবও অন্যতম নির্ণায়ক (determinant) ভূমিকা পালন করে থাকে (আদনান ২০১৩: ১১৮)। সোজা ভাষায়, যাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক জোর বেশি, জমি দখলের ক্ষেত্রে তাদের সফল হবার সম্ভাবনাও অধিক।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, ভূমিগ্রাসের যাবতীয় প্রক্রিয়া ও কলাকৌশলের মধ্যে সবগুলোতে না হলেও কোনো কোনোটিতে অনৈতিক আচরণ ঘটে। বিশেষ করে যেসব ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ ঘটে এবং সহিংসভাবে ভূমি বেদখল হয় সেসব পদ্ধতির নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। অনুরূপভাবে জালিয়াতি, দুর্নীতি এবং প্রতারণার মাধ্যমে যেসব ভূমিগ্রাস ঘটে সেগুলোও অনৈতিক।

লক্ষণীয় যে, রাষ্ট্রের ভূমিকাতেও অনৈতিক আচরণ রয়েছে। যেমন, 'জনস্বার্থে' ভূমি অধিগ্রহণ করা হয় বটে, তবে সেই জমি যখন প্রাইভেট মুনাফাকারী গোষ্ঠীকে প্রদান করা হয় তখন রাষ্ট্রের কথা ও কাজের অসঙ্গতি ধরা পড়ে। নিরাপত্তায়নের নামে যে ভূমিগ্রাস ঘটে সে ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র কোনো কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় বা জাতিগোষ্ঠীর প্রতি সরাসরি বৈষম্যমূলক আচরণ করে যা দেশের সংবিধান ও আইন বিরোধী এবং অনৈতিক। যেসব ক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনে নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে মাস্তান বাহিনী কিংবা দলীয় ক্যাডার দিয়ে জোর খাটানো হয় সেসব ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের আচরণে ন্যায়-অন্যায় ভেদাভেদ থাকে না।

রাষ্ট্রযন্ত্র ছাড়াও বেসরকারিভাবে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, ব্যবসায়িক কোম্পানী বা এনজিও কর্তৃক জোর খাটিয়ে ভূমি বেদখলের দৃষ্টান্ত উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া মিথ্যা আশ্বাস ও প্রলোভন দেখিয়ে ভূমিগ্রাসের লক্ষ্যার্জন করেছে বিভিন্ন বেসরকারি গোষ্ঠী ও প্রাইভেট কোম্পানী। এসব ক্ষেত্রেও ভূমিগ্রাসের পন্থাগুলো পরিস্কারভাবে অনৈতিক।

সুতরাং, এটা প্রতীয়মান যে, সমকালীন বাংলাদেশে ভূমিগ্রাসের যাবতীয় প্রক্রিয়া ও কলাকৌশলের অনেকগুলোই নৈতিকতার ধার ধারে না। বরঞ্চ, এসবের পেছনে কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা শ্রেণির স্বার্থ কাজ করে যা অন্যায্য ও বৈষম্যমূলক। এমনকি আইন ও নৈতিকতা রক্ষার দায়িত্ব যেসব প্রতিষ্ঠান বা কর্মকর্তার, তাদেরকেও ক্ষেত্র বিশেষে এর বিপরীত আচরণ করতে দেখা যায় ভূমি বেদখল করার স্বার্থে।

ভূমিগ্রাসের পেছনে যে ধরনের উদ্দেশ্য কাজ করে সেগুলোও সব ক্ষেত্রে এক নয়। বেদখল করে নিজের জমির পরিমাণে বাড়ানোকে এক ধরনের accumulation বা ধনার্জন প্রক্রিয়া হিসাবে দেখা হয়। ভূমিগ্রাসভিত্তিক ধনার্জন প্রক্রিয়ার ভেতরে আরও তফাৎ আছে যেগুলো তাত্ত্বিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রথমত: যখন কোনো প্রাক-পুঁজিবাদী (precapitalist) বা অ-পুঁজিবাদী (non-capitalist) সংস্থা, সম্প্রদায় বা শ্রেণির ভূমি বেদখল করে সেগুলো পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত করা হয় তখন সেই ভূমিগ্রাসটি আদি ধনার্জনের (primitive accumulation) আওতায় পড়ে। সমকালীন নয়াউদারবাদী বিশ্বায়নের যুগেও এই 'আদি' প্রক্রিয়াটি চলমান এবং এজন্য নতুন নতুন কলাকৌশলেরও উদ্ভব হয়েছে। এ প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হচ্ছে পুঁজিবাদী উৎপাদনের জন্য ক্রমাগতভাবে ভূমি, শ্রমশক্তি এবং অন্যান্য উপাদান সরবরাহ করা। সমকালীন বৈশ্বিক অর্থব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে যে ধরনের অভিনব ভূমিগ্রাস ঘটছে সেসব প্রক্রিয়াকে 'বেদখলের মাধ্যমে ধনার্জন' (accumulation by dispossession) অভিহিত করে পুনঃসংজ্ঞায়িত করেছেন হার্ভে (২০০৩: ১৪৪-১৬১)।

তবে ভূমিগ্রাসের সব ঘটনা আদি ধনার্জন কিংবা বেদখলের মাধ্যমে ধনার্জনের আওতায় পড়ে না। এর একটি নিদর্শন হচ্ছে কোনো পুঁজিবাদী খামার বা সংস্থার (capitalist enterprise) জমি অনুরূপ আরেকটি পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানের হাতে চলে যাওয়া। এই প্রক্রিয়া আদি ধনার্জন নয়। বরঞ্চ, এই প্রক্রিয়া হচ্ছে পুঁজির কেন্দ্রীভবন (centralisation of capital), যা পুঁজিবাদী ধনার্জনের (capitalist accumulation) অন্তর্গত। বিশেষ করে কৃষি ও অন্যান্য ভূমিভিত্তিক ধনতান্ত্রিক বিকাশের জন্য পুঁজির কেন্দ্রীভবন একটি অত্যাবশ্যক পূর্বশর্ত (কাউটস্কি ১৯৭৬, ১৯৮৮; আদনান ১৯৮৫)।

এগুলো থেকে ভিন্ন হচ্ছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কিংবা চর দখলের মতো ভূমিগ্রাসের ঘটনা। এগুলো পুঁজিবাদী বা আদি ধনার্জন কোনটারই আওতায় পড়ে না। এসব ক্ষেত্রে অধিকৃত জমিগুলো কোনো পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত হয় না। দৃষ্টান্তরূপ, জোতদাররা যখন চর দখল করে তখন সেই জমিগুলো

তারা ভূমিহীন বর্গাদার দিয়ে চাষ করিয়ে খাজনা বা prcapitalist ground rent আদায় করে। কাজেই, কোনো বিশেষ ভূমিগ্রাসের ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে গেলে দখলকৃত জমিটা কি ধরনের উৎপাদন সম্পর্কে ন্যাস্ত হচ্ছে তা বোঝা দরকার। তার ভিত্তিতেই নিরূপণ করা সম্ভব যে এই ভূমিগ্রাসের ঘটনাটি কি আদি বা পুঁজিবাদী ধনার্জনের আওতায় পড়ে, নাকি প্রাক-পুঁজিবাদী খাজনা আদায়ের জন্য ভূমি দখল প্রক্রিয়ার অংশ।

এটা প্রতীয়মান যে, ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়ার যথাযথ বিশ্লেষণের জন্য এমন একটি তাত্ত্বিক কাঠামোর (theoretical framework) প্রয়োজন যা বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন সম্পর্ক (production relations) এবং ধনার্জন প্রক্রিয়ার (accumulative process) মধ্যে গুণগত ও বিশ্লেষণাত্মক (analytical) পার্থক্য সনাক্ত করতে পারে। এ প্রবন্ধে উপরোক্ত তাত্ত্বিক বিষয়গুলো উল্লেখ করা হলেও বিস্তারিত আলোচনা করা গেল না সময় এবং পরিসরের অভাবে। তবে পরবর্তীতে ভূমি দখলের এসব তাত্ত্বিক (theoretical) ও তথ্যভিত্তিক (empirical) দিকগুলো আরও বিস্তারিত আলোচনার আশা রাখি।

তথ্যসূত্র

১. আইন ও সালিশ কেন্দ্র ও অন্যান্য ২০১৪। (Ain O Shalish Kendro o annyana: ASK, NK, ALRD, TIB, Bangladesh Adivasi Forum, BLAST, BELA, and BAPA*),* আইনবিধি, মানবাধিকার ও জনস্বার্থকে উপেক্ষা করে কৃষি জমি, বনভূমি দখল, অধিগ্রহণ ও বরাদ্দ প্রদান বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন উপস্থাপন। ঢাকা: সংবাদ সম্মেলনে প্রদত্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তি, ১৩ নভেম্বর ২০১৪।

২. আদনান, স্বপন ১৯৮৫। (Adnan, Shapan) 1985a, "Classical and Contemporary Approaches to Agrarian Capitalism", Economic and political Weekly, Vol. XX, No.30, pp.PE-53-64.

৩. আদনান, স্বপন ১৯৯১। (Adnan, Shapan), *Floods, People and the Environment: Institutional Aspects of Flood protection programmes in Bangladesh, 1990.* Dhaka: Research and Advisory Services (RAS).

৪. আদনান, স্বপন ২০০৪। (Adnan, Shapan), *Migration, Land Alienation and Ethnic Conflict: Causes of Poverty in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh,* Dhaka: Research and Advisory Services.

৫. আদনান, স্বপন ২০১৩। (Adnan, Shapan), Land grabs and primitive accumulation in deltaic Bangladesh: Interactions between neoliberal globalization, state interventions, power relations and peasant resistance. *The Journal of Peasant Studies*, 40:1, 87-128.

৬. আদনান, স্বপন ২০১৪। (Adnan, Shapan), Primitive accumulation and the transition to capitalism' in neoliberal India: Mechanisms, resistance, and the presistence of self-employed labour. Chapter 2 in Barbara Harriss-White and Judith Heyer (eds,) *Indian Capitalism in Development*, London: Routledge, pp. 23-45.

৭. আদনান, স্বপন ২০১৬ক। (Adnan, Shapan), Alienation in Neoliberal India and Bangladesh: Diversity of Mechanisms and Theoretical Implications, *South Asia Multidisciplinary Academic Journal* [Online], 13. Online since 06 April 2016, URL: http://samaj.revues.org/4130

৮. আদনান, স্বপন ২০১৬খ। বিল ডাকাতিয়ার গণ আন্দোলন'। সর্বজনকথা ৩:৯, নভেম্বর, পৃ ৬৫-৭০।

৯. আদনান স্বপন ২০১৭ ক। (Adnan, Shapan) 2017, "Land grabs, primitive accumulation, and resistance in neoliberal India: Persistence of the self-employed and divergence from the "Transition to Capitalism"?, Chapter 3 in Anthony D'Costa and Achin Chakraborty (eds) The Land Question in India: State, Dispossession and Capitalist Transition, Oxford: Oxford University Press, pp. 76-100.

১০. আদনান, স্বপন ২০১৭ খ। (Adnan, Shapan) বাংলাদেশে ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়া ও কলাকৌশলের বৈচিত্র, সর্বজনকথা, ৩:৪, আগস্ট-অক্টোবর, পৃ ২১-৩১।

১১. আদনান, স্বপন ও আহসান হাবিব মনসুর ১৯৭৭। (Adnan Shapan and Ahsan Habib Mansoor), Land, power and violence in Barisal Villages, *Policical Economy,* 2(1), 125-143.

১২. আদনান, স্বপন এবং অন্যান্য ১৯৯২। (S. Adnan, A. Barrett, S.M.N. Alam, A. Brustinow, Aminur Rahman and Abu M. Sufiyan), *People's Participation and the Flood Action Plan.* Dhaka: Research and Advisory Services and Oxfam-Bangladesh.

১৩. আদনান স্বপন এবং অন্যান্য ১৯৯৪ (আদনান, স্বপন. এ. ব্যারেট, এস.এম. নরুল আলম, এ. ব্রুস্টিসভ, মো. আ. রহমান ও আ.ম. সুফিয়ান)। জনগণের অংশগ্রহণ: ফ্যাপ প্রসঙ্গে এনজিওদের ভূমিকা। ঢাকা: রিসার্চ এ্যাণ্ড এ্যাডভাইজরী সার্ভিসেস ও অক্সফ্যাম-বাংলাদেশ।

১৪. আদনান, স্বপন ও রণজিৎ দস্তিদার ২০১১। (Adnan, Shapan and Ranajit Dastidar), *Alienation of the Lands of Indigenous Peoples of the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh, Dhaka:* Chittagong Hill Tracts Commission (CHTC) and Copenhagen: International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA).

১৫. আহাসান, আবু ও কেটি গার্ডনার ২০১৬। (Ahasan, Abu and Katy Gardner), Dispossession by Development': Corporations, Elites and NGOs in Bangladesh. *South Asia Multidisciplinary Academic Journal* [Online] 13 2016, URL: http://samaj-revues. org/4136.

১৬. টন, আর এম ১৯৯৭। (Eaton, R.M), *The rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204–1760.* Delhi: Oxford University Press.

১৭. এ্যান্ডারসন, বেনেডিক্ট ২০০৬। (Anderson, Benedict), *Imagined communities.* London: Verso.

১৮. ওয়াকার, ক্যাথি লে মনস ২০০৮। (Walker, Kathy Le Mons), Neoliberalism on the ground in rural India: Predatory growth, agrarian crisis, internal colonization, and the intensification of class struggle*: Journal of Peasant Studies,* 35 (4), 557-620.

১৯. কাউটস্কি, কার্ল ১৯৭৬। Kautsky, K. 1976. Summary of selected parts of Kautsky's The Agrarian Question. *Economy and Society*, 5(1), 1-49. Summarized by JairusBanaji.

২০. কাউটস্কি, কার্ল ১৯৮৮। Kautsky, K. 1988. *The Agrarian Question*, Volumes I and II. London & Winchester Mass: Zwan Publications.

২১. খান, মোহাম্মদ তানজিমুদ্দিন ২০১৫। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে শিল্পের নিরাপত্তাকরণ। *সর্বজনকথা* ১:৪, আগষ্ট, পৃ ২৫-২৭।

২২. গার্ডনার, কেটি ২০১২। (Gardner Katy), *Discordant Development:* Capitalism and the Struggle for Connection in Bangladesh. London: Pluto Press.

২৩. গার্ডনার, কেটি ও ইভা গেরহার্জ ২০১৫। (Gardner, Katy and Eva Gerharz), Land, Development and Security in Bangladesh and India: An Introduction. *South Asia Multidisciplinary Academic Journal [online*], 13/ 2016, URL:http:\\samaj.revues.org/ 4141.

২৪. গার্ডনার, কেটি, জহির আহমেদ, মোহাম্মদ মাসুদ রানা ও ফাতেমা বাশার ২০১৫। (Gardner, Katy, Zahir Ahmed, Mohammad Masud Rana and Fatema Bashar), Field of Dreams: Imagining Development and Un-Development at a Gas Field in Sylhet. *South Asia Multidisciplinary Academic Journal [online],* 9. URL: http:\ samaj.revues.org\ 3741.

২৫. গৌতম, দীপংকর ২০১৫। ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ওপর সংগঠিত হামলাঃ ছয় মাসের প্রতিবেদন। *সর্বজনকথা* ১:২, ফেব্রুয়ারী, পৃ ৭৫-৮২।

২৬. ডে উইল্ড, কে (সম্পাদক) ২০১১। de Wilde, K., (ed.), *Moving coastlines: Emergence and use of land in the Ganges–Meghna– Brahmaputra Estuary*. Dhaka: University Press.

২৭. পাপরকী, কাশ্যা ও জেসন কন্স ২০১৪। (Paprocki, Kasia and Jason Cons), Toward a political geography of food sovereignty: Transforming territory, exchange and power in the liberal sovereign state. *Journal of Peasant Studies,* 41 (6).

২৮. ফেয়ারহেড, জেমস, মেলিসা লীচ ও ইয়ান স্কুনস ২০১২। (Fairhead, James, Melissa Leach and Ian Scoones), Green Grabbing: A new appropiation of nature? *Journal of Peasant Studies,* 39(2), 237-261.

২৯. ফেল্ডম্যান, শেলী ২০১৬। (Feldman, Shelley), The Hindus as Other: State, Law, and Land Relations in Contemporary Bangladesh*, South Asia Multidisciplinary Academic Journal [online],* 13/2016, URL: http://samaj.revues.org/4111.

৩০. বড়ুয়া, জ্যোতির্ময় ব্যারিষ্টার (সম্পাদক) ২০১৩। (Barua, Jyotirmoy Barrister (ed.)) *রামু: সম্প্রদায়িক সহিংসতা সংকলন* । ঢাকাঃ দ্রিক (DRIK)।

৩১. বারকাত, আবুল ও প্রশান্ত কে, রায় ২০০৪। (Barkat, Abul and Prosanta K. Roy), *Political Economy of Land Litigation in Bangladesh: A case of colossal national wastage.* Dhaka: Association of Land Reform and Development (ALRD) and Nijera Kori.

৩২. ভাদুড়ী, অমিত ২০০৮। (Bhaduri, Amit) Predatory growth*. Economic and Political Weekly,* 43 (16), pp.10-14. (19 April*)*

৩৩. মার্ক্স, কার্ল ১৯৭৬। (Marx, Karl) *Capital: A critique of political economy.* Volume 1. London: Penguin.

৩৪. মির্জা, মাহা ২০১৫। (Mirza, Maha), বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলঃ ভারতের অভিজ্ঞতার একটি স্ন্যাপশট। *সর্বজনকথা*, ১:৪, আগষ্ট, পৃষ্ঠা ৫৩-৫৫।

৩৫. মুহাম্মদ, আনু ২০১৬। (Muhammad, Anu), ফুলবাড়ীর গল্প । *সর্বজনকথা* ২:৪, আগষ্ট, পৃষ্ঠা ৩২-৪৫।

৩৬. মোহসীন, আমেনা ১৯৯৭। (Mohsin, Amena), *The Politics of Nationalism: The Case of the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh.* Dhaka: University Press Limited.

৩৭. রহমান, মওদুদ ২০১৬। (Rahman, Modud) বাঁশখালির সাইরেন। *সর্বজনকথা* ২:৪, আগষ্ট, পৃ ২২-২৪।

৩৮. রায়, রাজা দেবাশীষ ১৯৯৫। (Roy, Raja Devasish), Land Rights, Land Use and Indigenous Peoples in the CHT,' in Philip Gain (ed). *Bangladesh: Land, Forest and Forest People.* Dhaka: Society for Environment and Human Development (SEHD).

৩৯. লেভিয়েন, মাইকেল ২০১২। (Levien, Michael) The land question: Special economic zones and the political economy of dispossession in India. *The Journal of Peasant Studies,* 39: 3-4, 933-969.

৪০. সর্বজনকথা, ২০১৪। (Sarbojankatha), আদিবাসী নারী নেত্রী বিচিত্রা তির্কীর ওপর বর্বর নির্যাতন: ভূমি দস্যুতা এবং নারী নির্যাতন যেখানে একাকার। *সর্বজনকথা* ১:১, নভেম্বর, পৃ ৫-৬।

৪১. সর্বজনকথা, ২০১৫। (Sarbojankatha), ভূমি আগ্রাসনের চিত্র। *সর্বজনকথা ১:২ ফেব্রুয়ারী*, পৃ ৭-৮।

৪২. সর্বজনকথা, ২০১৬। (Sarbojankatha), সুন্দরবন ঘিরে ১৫০ শিল্প প্রকল্প। *সর্বজনকথা*, ৩:১, নভেম্বর, পৃ ৪।

৪৩. সাম্পাত, প্রীতি ২০০৮। (Sampat, Preeti), Special Economic Zones in India. *Economic and Political Weekly,* 43 (28), 25-29, 12 July.

৪৪. সোবহান, রেহমান ২০০৭। (Sobhan, Rehman), *The political economy of malgovernance in Bangladesh: Collected works of Rehman Sobhan, Volume 3.* Dhaka: Centre for Policy Dialogue.

৪৫. হার্ভে, ডেভিড ২০০৩। (Harvey, David), *The New Imperialism.* Oxford; Oxford University Press.